ইসলামে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাবের কারণ

রাসূল যুগে মুসলিম জাতি সর্বোতভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় কারণে মুসলিম জাতি নানা দল ও চিন্তাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা ধর্মের কেন্দ্রীয় বাণীর প্রতি সমানভাবে আস্থাশীল থেকেও ধর্মের তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে স্ব-স্ব ব্যাখ্যার আলোকে নতুন নতুন দল তৈরি করেন, আর একে ভিত্তি করেই গড়ে তোলেন এক বর্ণাঢ্য ধর্মীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি। গবেষকগণ এর নেপথ্যে নিম্নোক্ত কারণসমূহ শনাক্ত করেছেন।

১. **আইন ব্যাখ্যাতার সংখ্যাধিক্য :** রাসূল যুগে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা মত প্রকাশের অবকাশ ছিল না। কেননা তখন কুরআন নাজিল হতো। সে জন্য কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মহানবী (স.) সমীপে নিবেদন করা হতো। আর সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (স.) সে সমস্যার সমাধান করে দিতেন অথবা কুরআন নাজিল হয়ে সমস্যার সমাধান নির্দেশ করত। সে জন্য তখন আইন প্রকাশের লক্ষ্য ছিল মাত্র একটি। আইন প্রবর্তনের ক্ষমতাও একান্তভাবে মহানবী (স.) সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর অবস্থা অনেকখানি বদলে গেল। সাহাবী যুগে মহানবী (স.)-এর একার পরিবর্তে আইন ব্যাখ্যাতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল। সাহাবীগণ নিজ নিজ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে আইনের ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করলে তাতে ভিন্নতা তৈরি হলো এবং এভাবেই ইসলামে মতভেদের বীজ রোপিত হলো। তাবিঈ যুগে এসে এ মতবাদ-মতানৈক্য বিপুলায়তনে বিস্তৃত হলো। আর এরই পথ ধরে ইসলামে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের পথ সুগম হলো।

২. **কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যায় মতদ্বৈততা :** রাসূল যুগ শেষে ইসলাম আরব-অনারব অনেক দেশেই বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। এসব দেশের নাগরিকগণ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দেশ, সমাজ ও সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁদের চিন্তা, আদর্শ ও শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। মহানবী (স.)-এর বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁরা নিজেদের মত ব্যক্ত করেননি, করার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কিন্তু তাঁর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় নানা মতবাদ-মতবিরোধ দেখা দিলে প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করার ও তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এভাবে সাহাবী ও তাবিঈদের পর্যায়ে কুরআন এবং হাদীস ব্যাখ্যায় মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত ঘোষণা করেন এবং এভাবেই উদ্ভব ঘটে নতুন নতুন মতবাদের।

৩. **বহুজাতিক জীবন দর্শন :** মহানবীর পরলোক গমনের কিছু দিনের মধ্যেই সমগ্র আরব দেশ, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পারস্যের জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত

Scanned by CamScanner

হয়। এসব স্থানে অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের বিরোধ দেখা দেয়। যেসব জাতি এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে তেমন কিছুই অভিন্ন ছিল না। তারা স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের বিগত সংস্কৃতি ও ধর্মাচারের বিভিন্ন বিষয় ইসলামে একীভূত করার চেষ্টা করে। এ কারণে ধর্মানুশীলনে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, আর এ বিভিন্নতা সমর্থন করতে গিয়েই বিভিন্ন মহলে মতপার্থক্য বৃদ্ধি পায়; যা নতুন নতুন মতবাদ তৈরির পথ সুগম করে দেয়।

৪. **ইসলামের বিশ্বজনীন প্রেরণা :** ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। পৃথিবীর সব দেশের, সব কাল ও মানুষের জন্য এ আদর্শ আল্লাহ্ প্রদান করেছেন বলে এর অনুসারীগণ বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এতে ইসলাম বহুজাতিক জনগোষ্ঠীর একটি নতুন মতাদর্শে পরিণত হয়; যাতে একদিকে বহু জাতির জীবন দর্শনে দ্বিধাবিভক্ত নওমুসলিম, আর অপরদিকে বিজয়ী মুসলমানরা তাদের নতুন বিজিত জাতিসমূহের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে খাপ খাইয়ে নেয়ার এবং বিজিত দেশসমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যতটুকু সম্ভব গ্রহণের প্রয়াস পায়। ইসলামের এ বিশ্বজনীন প্রেরণা তার সমর্থকদের অপরের সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি সহনশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরের সংস্কার ও সংস্কৃতির সমন্বয় বিধানের এই যে প্রচেষ্টা, তা থেকেও ইসলামে নতুন নতুন মতবাদ তৈরি হয়, নতুন নতুন সম্প্রদায় ও চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

৫. **ক্রমবর্ধমান সমস্যা :** ইসলামের প্রারম্ভিক পর্যায়ে মুসলমানরা তাদের নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রচারে এতই ব্যস্ত ছিল যে, তখন এর বিধানাবলির খুঁটিনাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সময়ও তাদের তেমন ছিল না। তাঁরা সমস্যায় পড়তেন, সমাধানের পথ তাঁদের ভাবতেও হতো না। তাঁরা কেবল সমস্যাটি মহানবীর (স.)-এর কাছে পেশ করতেন। তিনিই সমাধানের পথ নির্দেশ করতেন। কিন্তু মহানবীর (স.) পরলোক গমনের পর নতুন নতুন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এমন সব জটিল সমস্যা দেখা দেয় যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআন মাজীদে ছিল না এবং যার অকাট্য সমাধান দেয়ার জন্য নবী (র.)ও জীবিত ছিলেন না। এসব সমস্যা সমাধানের কৌশল ও পদ্ধতি ঠিক করতে গিয়ে সাহাবীগণ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমানহারে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। এসব ভিন্ন মত বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের বিভক্ত করে দেয়।

৬. **নেতৃত্বের সংকট :** মুসলমানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তাকে কেন্দ্র করে কতিপয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। মহানবীর (স.) শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে গণতন্ত্র ও সব মানুষের জন্য সমান অধিকারের

Scanned by CamScanner

প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং এজন্যই মুসলমানরা নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করে। লক্ষ করা গেছে যে, যেখানেই নির্বাচনের অবকাশ রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিভিন্ন দল ও মতের উদ্ভব হয়ে থাকে। ইসলামের বেলায়ও এ নিয়মের অন্যথা হয়নি। নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মুসলমানরা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। বিশেষত মহানবী (স.) তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচিত করে যাননি বিধায় তাঁর ইন্তিকালের পর মুসলিম বিশ্ব নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে সমূহ সংকটে পতিত হয়। সাময়িকভাবে এ সমস্যার সমাধান হলেও অভ্যন্তরে তা বিভেদের বীজ রোপণ করে। পরবর্তীকালে খারিজী, শীয়া, রাফিজী প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব এ মতভেদেরই ফলশ্রুতি।

৭. **গ্রিক দর্শনের প্রভাব :** ধর্ম হিসেবে ইসলামকে যুক্তিসঙ্গত করা এবং একটি সমর্থনযোগ্য ও নির্ভরশীল যৌক্তিক বিধানের ওপর একে দাঁড় করার প্রচেষ্টা থেকেও ইসলামে বিভিন্ন গোত্রের সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে মুসলমানরা প্রধানত তাদের ধর্ম ব্যাখ্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা গভীর বিচারমূলক চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। তাঁরা তাঁদের ধর্মকে যুক্তির আলোকে বিচার করার এবং প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনের আলোকে বুঝার প্রয়াস পায়। ইসলামকে যুক্তিসঙ্গত করার এ মনোবৃত্তিই কালক্রমে ইসলামে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের পথ প্রসারিত করে।

৮. **জ্ঞানের উৎস নিরূপণে ভিন্নতা :** জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের ওপর বিভিন্ন রূপে গুরুত্বারোপ করায় মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ইসলাম নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়াও জ্ঞানের আরও তিনটি উৎস নির্দেশ করে। যথা– প্রজ্ঞা (আকল), সামাজিক আচরণ (নকল) ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (কাশ্‌ফ)। মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদের জীবনের কতিপয় ঘটনা প্রজ্ঞার সাহায্যে, কতিপয় সমস্যা সামাজিক আচরণের মাধ্যমে এবং কতিপয় ঘটনা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে উপদেশ দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে, জীবনের সমস্যাবলি উপলব্ধির জন্য, জীবন-জগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য জ্ঞানের এ পদ্ধতিগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালক্রমে মুসলিম চিন্তাবিদরা প্রজ্ঞা, সামাজিক আচরণ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ওপর সমান গুরুত্বারোপ না করে কেউ প্রজ্ঞার ওপর, কেউ সামাজিক প্রথার ওপর আর কেউ বা গুরুত্বারোপ করেন স্বজ্ঞার ওপর। ফলে ইসলামে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

৯. **রাজনৈতিক কারণ :** খোলাফায়ে রাশীদার তৃতীয় সদস্য উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড, চতুর্থ সদস্য হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যস্থিত গৃহযুদ্ধ, কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনার পাশাপাশি উমাইয়া-আব্বাসীয়

Scanned by CamScanner

শাসনের স্বার্থ রক্ষার জন্যও বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটে। এ ধারায় জন্মলাভ করে শীয়া, খারিজী, মুরজিয়া, সুন্নী প্রভৃতি মতবাদসমূহ।

১০. **ইতিহাসের ধারা :** মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত গতিশীল একটি বিষয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর কোনো আদর্শ বা মতবাদই খুব বেশিদিন এক অবস্থানে বিনা বিবর্তনে অবস্থান করেনি। বরং বিভিন্ন সময় তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা গবেষণার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত ইতিহাসের স্বাভাবিক এ ধারাতেই ইসলামে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা-চিন্তা-চেতনার গতিশীলতা হলো যে কোনো মতবাদের জন্য প্রাণসঞ্জীবনী। এর অনুপস্থিতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ মতবাদকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। বস্তুত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই ইসলামে চিন্তা-গবেষণার দ্বার অবারিত রাখা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন প্রমাণের পেছনে এর ভূমিকাই প্রধান ও প্রথম। জর্জ বার্নাড'শ এজন্যই বলেছেন, "ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মানব জাতির পরিবর্তনশীল সব অবস্থাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং সব যুগেই প্রযোজ্য।" (Islam is the only religion which appears to me possess assimilating capacity to the changing phases of humanity which can make its appeal to every age.) কাজেই ইসলামে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভবকে এর অন্তর্নিহিত অনৈক্য বা ব্যর্থতা বলা যাবে না বরং এ হলো ইসলামের স্থায়িত্ব ও পূর্ণাঙ্গতারই এক বিশিষ্ট রূপ।

ইসলামে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ

ইসলামে যে সব সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তার মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, কিছু ধর্মতাত্ত্বিক, কিছু দার্শনিক আর কিছু কিছু সম্প্রদায় আইনি। রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে খারিজী, শীয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়। ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাবারিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া ও সিফাতিয়া সম্প্রদায়। মুতাযিলা, আশারিয়া, সূফী ও ফালাসিফা হলো ইসলামের অন্যতম প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়। ইসলামের আইনি সম্প্রদায় হিসেবে খ্যাত হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী সম্প্রদায়।

১. **খারিজী সম্প্রদায় :** ইসলামের ইতিহাসে খারিজীরা ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। হযরত আলী (রা.) সিফফিন যুদ্ধের নিশ্চিত জয় মুয়াবিয়া (রা.)-এর কূটনীতির কাছে বিলিয়ে দিলে তাঁর একদল সমর্থক ... করেন এবং দল ...

Scanned by CamScanner

খারিজী
[Kharijites]

মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে খারিজীগণ একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। খারিজী অর্থ দলত্যাগী। খারিজী শীর্ষক গোষ্ঠীটি অন্যান্য মুসলিমগণের দল ত্যাগ করে একটি নতুন দল গঠন করায় তাদেরকে খারিজী নামে অভিহিত করা হয়। ইতিহাস খ্যাত সিফফিন যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) নিশ্চিত জয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পরও মুআবিয়া (রা.)-এর কূটকৌশলের কারণে জয় বঞ্চিত হন এবং প্রহসনের আলোচনায় আলী (রা.) পরাজয় বরণ করেন। এমটি প্রেক্ষাপটে হযরত আলী (রা.)-এর ১২ হাজার অনুসারী তাঁর দল ত্যাগ করে একটি নতুন ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে। হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন মূল ধারার মুসলিম উম্মাহ থেকে বেরিয়ে নতুন দল গঠনের জন্যই দলটি খারিজী নামে ইতিহাসখ্যাত হয়।

অবশ্য এ দলটির নামকরণ সম্পর্কে অন্য একটি মতও রয়েছে।

খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর সময়কালে খ্যাতিমান সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী (রা.) সর্বপ্রকার পার্থিব প্রভাব হতে ইসলামের বিশুদ্ধতা ও সরলতা বজায় রাখার জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে উমাইয়াদের প্রভাব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দান করেন। উমাইয়াদের বিলাসিতা ও পার্থিব ভোগ-লালসার বিরোধিতা করতে গিয়ে খারিজী দলের উদ্ভব ঘটে। এ মতবাদের ধারকগণ বলেন, কুরআন মাজীদের একটি বিশেষ ঘোষণা থেকে খারিজী দলটির উৎপত্তি, যে ঘোষণায় মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর পথে যে হিজরত করে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থান ও সচ্ছলতা খুঁজে পায়। কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূলের পথে বাড়ি-ঘর পরিত্যাগ করে হিজরত করে অতঃপর প্রবাসেই মৃত্যুবরণ করে, তার পুরস্কার নিশ্চিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে পাওনা হয়ে যায়। আর মহান আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।"

খারিজীগণ নিজেদেরকে মহান আল্লাহর পথে খারিজ বা বহির্গত বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু দলটির ভাবধারা ও উগ্রতা তাদের এ বিশ্বাস সমর্থিত ছিল না। বরং তাদের উগ্র ভাবধারা ও বিশৃঙ্খল কার্যক্রমের জন্য সাধারণ মানুষরাই বলত যে, তারাই ইসলামের সীমা থেকে খারিজ হয়ে গেছে। এ থেকেই তারা খারিজী হিসেবে খ্যাত হতে থাকে।

খারিজীগণের নিজস্ব খলীফা ছিল এবং সাধারণত তাকে তারা আমীরুল মুমিনীন বা মুমিনগণের নেতা হিসেবে সম্বোধন করত। খারিজী খলীফাগণ প্রকাশ্যে নামাযে অংশ নিতেন এবং সৈন্য পরিচালনা করতেন। তবে খলীফার মৃত্যুতে

Scanned by CamScanner

খারিজীগণ প্রায়ই বিভিন্ন বিরোধে জড়িয়ে পড়তে থাকেন এবং এর ফলে আরো নতুন নতুন দল তৈরি হয়। এভাবে কালক্রমে খারিজী সম্প্রদায় প্রায় বিশটি উপদলে বিভক্ত হয়। উপদলগুলোর মধ্যে আযারিকা, নাযদিয়া, ইবাদিয়া, সাফাতিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মুসলিম জাতির ইতিহাসে খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব বিভিন্ন সময়ের শাসকদের প্রতি অনাস্থা ও অসন্তুষ্টিজাত। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যহীনতা, ছদ্মবেশী মুসলিমদের হীন ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতালোভী কিছু বিপথগামী ব্যক্তিত্ব এ সম্প্রদায়ের উদ্ভবে ভূমিকা রাখে। সময়ের আবর্তনে এ সম্প্রদায় ক্রমবিকশিত হয় এবং দর্শন, ভিত্তি ও নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপশালী দলটি নিরীহ ধর্মতাত্ত্বিক দলে পরিণত হয়।

১. **হযরত আবু জার (রা.)-এর নির্বাসন ও উসমান (রা.)-এর শাহাদাত :** শাসক হিসেবে হযরত উসমান (রা.) ছিলেন দয়াশীল, উদার এবং ক্ষমাপ্রবণ। তাঁর এই দয়াশীলতা, উদারতা ও ক্ষমাপ্রবণতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের আদর্শ পরিপন্থি ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন শুরু করে। বিশেষত উমাইয়াদের মধ্যে এই প্রবণতা অধিকতর প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শ্রেষ্ঠতম সাহাবীগণের অন্যতম হযরত আবু জর গিফারী (রা.) এর প্রতিবাদ করেন। তাঁকে রাবাধা নামক স্থানে নির্বাসন দেয়া হয়। দু'বছর নির্বাসিত জীবন-যাপন শেষে তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। আবু জার (রা.)-এর অনুসারীগণ হযরত উসমান (রা.) কে খিলাফতের অবৈধ দখলকারী অভিহিত করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ জন্য তারা ইয়েমেনের ইবনে সাবাহ'র নেতৃত্বাধীন দলে যোগ দেয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত করে।

২. **তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত :** হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইবনে সাবাহ'র নেতৃত্বাধীন চরমপন্থিরা হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষাবলম্বন করে এবং শহীদ খলীফার বংশধর উমাইয়াদের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ লক্ষ্যে তারা উটের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)কে সমর্থন দেয়। কিন্তু আলী (রা.) মুসলিম উম্মাহ'র সংহতি ও শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হযরত তালহা ও যুবায়র (রা.)-এর সঙ্গে শান্তি সন্ধি স্থাপন করেন। এর ফলে চরমপন্থিরা হযরত আলী (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয় এবং সন্ধি মোতাবেক

Scanned by CamScanner

হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনা ফেরার পথে তাঁদের হত্যা করে। এর ফলে তাদের উগ্রতা ও অবাধ্যতার বিষয়টি প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।

সিফফিনের যুদ্ধ : উটের যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর হযরত আলী (রা.) সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন। মুআবিয়া (রা.) ছিলেন উমাইয়া বংশের, আর চরমপন্থিগণ উমাইয়াদের ধ্বংস করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কাজেই তারা মুআবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-কে সমর্থন করল। অবশেষে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিফফিন প্রান্তরে হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে মুআবিয়া (রা.)-এর তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর যখন বিজয় প্রায় নিশ্চিত তখন ধূর্ত মুআবিয়া (রা.) পবিত্র কুরআন উত্তোলন করে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন এবং কুরআনের বিধান অনুসারে সালিশি দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করা হবে বলে প্রস্তাব দিলেন। হযরত আলী (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর কূটকৌশল বুঝতে পারলেও সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যের আবেগ এবং কুরআনের প্রতি অবিচল আস্থার জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। উমাইয়া বিরোধী চরমপন্থি দল এর তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তারা উমাইয়াদের ইসলামের শত্রু মনে করত এবং কায়মনোবাক্যে তাদের ধ্বংস কামনা করত। হযরত আলী (রা.) উমাইয়াদের ধ্বংস করার পরিবর্তে সন্ধি ও আলোচনার প্রস্তাব মেনে নেয়ায় তারা খলীফার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো। তারা মানুষের ফায়সালা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ঘোষণা করল, "আল্লাহর আইন ছাড়া কোনো আইন নেই।"

৪. **দুমাতুল জানদালের সালিশ ও খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ :** হযরত আলী-মুআবিয়া (রা.)-এর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে দুমাতুল জানদালে সালিশ বসে। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মূসা আশয়ারি (রা.), আর মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত আমরের চাতুর্য ও কূটকৌশলের কারণে সালিশি বৈঠক প্রতারণায় পর্যবসিত হয়। সালিশে হযরত আলী (রা.)-এর কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়ে উমাইয়াদের ধ্বংসাকাঙ্ক্ষী চরমপন্থি ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল হযরত আলী (রা.)-এর দল ত্যাগ করে এবং কুফার হারুরা নামক স্থানে সমবেত হয়ে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। এভাবে স্বকীয় দল হিসেবে খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হযরত আলী (রা.)-এর দল ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে সমবেত হয়ে দল গঠন করার জন্য ইতিহাসে এই দলটি খারিজীর পাশাপাশি হারুরীয়া নামেও পরিচিত লাভ করে।

Scanned by CamScanner

৫. **খারিজীদের অপতৎপরতা :** আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব খারিজীদের নেতা নির্বাচিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে খারিজীরা নাহরাওয়ানে শিবির স্থাপন করে। ওদিকে দুমাতুল জানদালের প্রতারণার সালিশ প্রত্যাখ্যান করে হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকগণ তাঁকে মুআবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে আবারো যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ জানায়। কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশের পক্ষ ত্যাগ, মুআবিয়া (রা.) ও আমর বিন আস (রা.)-এর কূটকৌশল ইত্যাদি বাস্তব কারণে আলী (রা.) আরো রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে তাঁর অবশিষ্ট বাহিনীর অনেকেই পক্ষ ত্যাগ করে নাহরাওয়ানে খারিজীদের সঙ্গে মিলিত হয়। নতুন সমর্থক দল পেয়ে খারিজীরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে হযরত আলীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে লাগল এবং জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করে চলল। তারা লুটতরাজ শুরু করল এবং বিভিন্নভাবে মানুষের শান্তি নষ্ট করতে লাগল।

৬. **নাহরাওয়ান যুদ্ধ :** খারিজীদের অব্যাহত গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য শেষ পর্যন্ত আলী (রা.) তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে খারিজী নেতা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাবসহ বহুসংখ্যক খারিজী নিহত হয়।

৭. **হত্যার রাজনীতির সূচনা :** নাহরাওয়ানের পরাজয় খারিজীদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটাতে ব্যর্থ হয়। বরং তারা মুসলিম বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির জন্য হযরত আলী (রা.), হযরত মুআবিয়া ও হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে দায়ী করে তাদেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ জন্য তারা তিনজন গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হযরত আলী (রা.)-ই কেবল গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন। সৌভাগ্যক্রমে হযরত মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.) বেঁচে যান। এভাবে খারিজীরা মুসলিম বিশ্বে হত্যার রাজনীতি শুরু করে।

৮. **উমাইয়া যুগে খারিজী সম্প্রদায় :** হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত মুআবিয়া (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যথারীতি খারিজীরা তার বিরুদ্ধাচারণ করে। তারা আহওয়াজে তাদের ক্ষমতা ছয়টি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেখান থেকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। তারা উমাইয়া শাসকদের ন্যায়সঙ্গত খলীফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। বসরা ও কুফাতে তাদের সমর্থক ছিল। এ সময় নাফে বিন আযরাক ছিলেন খারিজীদের মনোনীত খলীফা। তাঁর অনুগত-অনুসারীই আযরাকী হিসেবে পরিচিত। ইবনে আযরাকের নেতৃত্বে খারিজীরা কুর্দিস্তান, ফারস ও কিরমান দখল করে। তারা নানাভাবে মুআবিয়া (রা.) কে

Scanned by CamScanner

হয়রানি করে এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালায়। মুআবিয়া (রা.) খারিজীদের দমনে ব্যর্থ হন।

ইতোমধ্যে ইবনে আযরাক মৃত্যুবরণ করেন। খারিজীদের নেতা নির্বাচিত হন নাযদা বিন আমর। তার অনুসারীরা ইতিহাসে নাযদিয়া নামে পরিচিত। নাযদার মৃত্যুর পর আব্দুল্লাহ ইবনে ইবাদ খারিজীদের খলীফা মনোনীত হন। তিনি শান্ত প্রকৃতির মধ্যপন্থি খারিজী নেতা হিসেবে সমাদৃত হন এবং তার অনুসারীরা ইবাদিয়া নামে খ্যাত হয়।

উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের শাসনামলে কয়েকজন সাহসী নেতা ও সৈনিক ব্যক্তি খারিজীদের নেতা মনোনীত হন। সালেহ বিন মিসরা, শাবীব বিন ইয়াযিদ এদের অন্যতম। শাবীব কীর্তিমান খারিজী নেতা হিসেবে খ্যাত। তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রেরিত সেনাবাহিনীকে কয়েকবার পরাস্ত করেন। তাঁর অনুসারীগণ শাবীবিয়া খারেজী হিসেবে খ্যাত। শাবীবের অনুসারীগণ মনে করতেন, নারীগণও ইমাম ও খলীফা হতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ ও সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে শাবীবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারেনি। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসূফের হাতে পরাজিত হয়ে দক্ষিণ ইরাকে বিতারিত হন। ঠিক এ সময় পারস্যে কাতারী ইবনে আলফুযা নামে খারিজীদের আরো একজন খলীফা নির্বাচিত হন। কাতারী অন্য খারিজী নেতা আবদারবা আল-কাবিরের সঙ্গে কলহ করে তার অনুসারীদের নিয়ে তাবারিস্তানে যান। পরে আবদারবা ও কাতারী উভয়ই হাজ্জাজ বিন ইউসূফের বাহিনীরে হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

এভাবে উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের শাসনামলে খারিজী শক্তি অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইরাক ও পারস্যে শক্তি খর্ব হওয়ার পর খারিজীরা আফ্রিকায় চলে যায়। সেখানে একটি নতুন খারিজী সম্প্রদায় আযরাকীদের অনুসরণে নিজেদের উগ্রতা ও গোঁড়ামির বিস্তারে ভূমিকা রাখে।

উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে খারিজীরা তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে আরো একবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হয়। যাহাক বিন কায়েসের নেতৃত্বে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় তারা খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় উমাইয়া শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিশাল খারিজী বাহিনীর সহায়তায় যাহাক ইরাক আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। কুফাও তার অধীনস্থ হয়। দ্বিতীয় মারওয়ান নিজে যাহাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে যাহাক পরাজিত হন বটে কিন্তু খারিজীরা

Scanned by CamScanner

পুরোপুরি নিরস্ত হয় না। বরং দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে মনোনিবেশ করলে খারিজীরা বাইজান ও মদীনা দখল করে নেয়।

৯. **আব্বাসীয় শাসনামলে খারিজী সম্প্রদায় :** উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাসীন হয় আব্বাসীয় বংশ। গোঁড়া থেকে উমাইয়া বিরোধী খারিজীদের এতে শান্ত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। আব্বাসীয় শাসনামলেও তারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আব্বাসীয় শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে এবং প্রতিটি বিদ্রোহ অত্যন্ত নির্মমভাবে শেষ করে দেয়। এ সময়ে আফ্রিকার খারিজীরা একই রকম বিদ্রোহ শুরু করলে আগলাবী শাসকরা তাদেরকে কোথাও স্থির হতে দেয়নি। মিসরের ফাতেমী শাসকরাও একই রকম দমন নীতি অনুসরণ করে।

১০. **খারিজীদের মূলনীতি পরিবর্তন :** উমাইয়া শাসক উমর বিন আবদুল আযীয এবং আব্বাসীয় শাসক আল-মামুন ছাড়া অন্য কোনো উমাইয়া বা আব্বাসীয় শাসককে খারিজীরা স্বীকার করেনি। কিন্তু বারবার বিদ্রোহ ঘোষণার পর শাসকবর্গের কঠোর দমননীতি ও ক্রমাগত আক্রমণে তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের কোথাও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে তারা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্তভাবে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন করে শান্তিপ্রিয় ধর্মতাত্ত্বিক দলে পরিণত হয়।

খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদ

ঐতিহাসিক খোদা বক্স বলেন, "খারিজীরা ছিল ইসলামের বিশুদ্ধবাদী– ধর্মে গোঁড়া, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী।" খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণ করলে কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন–

১. **গণতন্ত্র :** খারিজীরা গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতে, খলীফাকে অবশ্যই সমগ্র মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। খিলাফত কোনো বিশেষ গোত্র, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না। যোগ্য ব্যক্তি হলে যে কোনো মুসলিম এমনকি হাবশী গোলাম ও নারীও খলীফা নির্বাচিত হতে পারবে।

২. **খলীফার যোগ্যতা :** খারিজীদের মতে, যোগ্যতাই খলীফা নির্বাচিত হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হবে। খলীফাকে ...

Scanned by CamScanner

খারিজীদের ধর্মীয় মতবাদ

উগ্র ও বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে পারদর্শী খারিজীরা তাদের ধর্মীয় মতবাদে উগ্রতা ও নেতিবাচক চিন্তারই প্রতিফলন ঘটায়। যেমন–

১. **ধর্মীয় কর্তব্য পালন :** খারিজীদের মতে, যে মুসলিম নিয়মিত নামায, রোযা ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে না সে কাফিরদের সমপর্যায়ভুক্ত বা ধর্মদ্রোহী। এ ধর্মদ্রোহিতার জন্য পরিবারবর্গসহ তাকে হত্যা করা কর্তব্য। এমন ব্যক্তি খলীফা পদে অভিষিক্ত থাকলে তাকে পদচ্যুত করে হত্যা করা আবশ্যক।

২. **কবীরা গুনাহ :** খারিজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করার পর তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে সে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

৩. **ইসলামচ্যুতি :** খারিজীরা বিশ্বাস করে, একটি মাত্র অন্যায় কাজই মানুষকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে। তাই কোনো মুসলিম কোনোক্রমেই কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। অন্যায় করে কেউ মুসলিম থাকতেও পারে না।

৪. **ঈমান ও আমল :** খারিজীদের মতে, ঈমান শুধু মৌখিক বিশ্বাস নয়, প্রত্যেক ধরনের পাপ কাজ হতে বিরত থাকলেই ঈমান টিকে থাকতে পারে। তারা ঈমান ও আমলের সুদৃঢ় সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। তাদের মতে, আমল ছাড়া ঈমানের এবং ঈমান ছাড়া আমলের কোনো মূল্য নেই।

৫. **বিবেকের শুদ্ধতা :** খারিজীরা ঈমান ও আমলের মতো বিবেকের শুদ্ধতার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে। তাদের মতে, বিবেকের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। যদি কোনো ব্যক্তি বিবেকের পবিত্রতা বজায় রাখতে না পারে তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে মুরতাদ। অবিশ্বাসীর জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে বিবেকের শুদ্ধতা বজায় রাখতে না পারা মুরতাদও সে শাস্তিই পাবে। খারিজীদের মতে, কাফিরদের সন্তানাদি তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে একই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৬. **অন্যান্য মুসলিম :** খারিজীদের মতে, কেবল তারাই আল্লাহর পথের যাত্রী। তারা ছাড়া যারা ঘরে বসে থাকে এবং তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে বের হয় না, তারাও কাফির। অন্যতম খারেজী উপদল আজারিকাদের মতে, খারেজী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমগণ কাফির বা ধর্মদ্রোহী এবং তাদের প্রতি কোনোরকম করুণা করা যাবে না। পরিবারবর্গসহ তাদেরকে হত্যা করাই শ্রেয়।

৭. **ইজতিহাদ :** আজারিকাদের মতে, ইজতিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা কুরআন মাজীদের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের যে অর্থ তারা সে হিসেবেই বিধান প্রণয়ন ও পালনকে কর্তব্য মনে করে।

Scanned by CamScanner

৮. **হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্ক :** খারিজীরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। তারা হৃদয়বৃত্তিক দুর্বলতা, প্রেম বা সম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করত। এ জন্য তারা কুরআন মাজীদের সূরা ইউসুফকে অগ্রহণীয় মনে করত। কারণ এতে হৃদয়বৃত্তিক দুর্বলতা ও প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে। তারা একে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে বিশ্বাস করত।

৯. **মুসলিম খলীফা ও শাসক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি :** খারিজীদের মতে, হযরত আলী (রা.) কাফির, কারণ তিনি আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে মানুষের বিচার মেনে নিয়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি এবং ৪ হাজার সাহাবী (রা.) কে হত্যা করেছেন, যারা সকলেই খারিজী ছিলেন। হযরত আলীর মতো তাঁর সন্তানগণও কাফির। কারণ তাঁরা অন্যায় যুদ্ধে তাঁদের পিতাকে সমর্থন দিয়েছেন।

খারিজীদের মতে, হযরত তালহা ও যুবায়র (রা.)ও কাফির ছিলেন। কারণ তারা হযরত আলী (রা.)-এর বশ্যতা স্বীকার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

খারিজীদের মতে, হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) কাফির। কারণ তিনি মুসলিম রক্তপাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হযরত আমর ইবনুল আস ও আবু মূসা আশআরী (রা.)ও কাফির। কারণ তাঁরা দুমাতুল জানদালের সালিশে মধ্যস্থতা করেন। একইভাবে ইয়াজিদও কাফির। কারণ তিনি অন্যায়ভাবে মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতা দখল করেন।

১০. **সমকামিতার শাস্তি :** খারিজীরা সমকামিতার শাস্তি রহিত করেন। কারণ, তাদের মতে সমকামিতার শাস্তির ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এ জন্য কোনো নির্দেশও দান করা হয়নি।

খারিজীদের উপদলসমূহ

খারিজীরা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দেয় এবং সে মতবাদের ভিত্তিতে নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন–

১. **আজারিকা :** খারিজীদের মধ্যে আজারিকা সম্প্রদায় সবচেয়ে গোঁড়া এবং সংকীর্ণমনা। নাফী বিন আজরাক এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারেই দলের নাম আজারিকা।

Scanned by CamScanner

২. **নাজদিয়া :** খারিজী সম্প্রদায়ের মূল মতবাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপদল হলো নাজদিয়া। নাজদা বিন আমর এ উপদলের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মীয় মতাদর্শে অবশ্য নাজদিয়ারা প্রায় আজারিকাদের সম পর্যায়ভুক্ত।

৩. **ইবাদিয়া :** খারিজী উপদলসমূহের মধ্যে ইবাদিয়ারা মধ্যমপন্থি হিসেবে খ্যাত। আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তারা খারিজী সম্প্রদায় বহির্ভূত মুসলিমদের কাফির মনে করে না এবং তাদেরকে হত্যা করা আবশ্যক বলে গণ্য করে না।

৪. **সাভাবিয়া :** যায়দ বিন আফসার সাভাবিয়া উপদলের প্রতিষ্ঠাতা। তারা মনে করে, যারা খারিজী নয় তারা অমুসলিম। সাভাবিয়াদের মতে, মুসলিম দেশসমূহ মূলত অমুসলিমদের লীলাভূমি। তারা কবীরা গুনাহকে কুফরি মনে করে এবং কবীরা গুনাহকারীকেও কাফির মনে করে।

বস্তুত রাজনৈতিক মতবাদে যেমন তেমনি ধর্মীয় মতবাদেও খারিজীরা অত্যন্ত উগ্রপন্থি। এ কারণেই বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র মানুষের সক্রিয় চেষ্টার পরও মুসলিম বিশ্বের কোথাও খারিজীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা সাধারণ মুসলিমগণ তাদেরকে গ্রহণ করেননি। অবশ্য সমকালীন রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে তাদের গণতান্ত্রিক চেতনা অধিকতর ইসলাম সমর্থিত হলেও উগ্র পন্থা ও চরম নীতি অবলম্বনের কারণে মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই খারিজী সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তারপরও মুসলিম জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক পথপরিক্রমায় খারিজী সম্প্রদায় একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Scanned by CamScanner

শীয়া
[Shi'ites]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পরে মুসলিম উম্মাহ নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক কারণে যেমন, তেমনি রাজনৈতিক কারণেও বিভিন্ন মত ও দল তৈরি হয়। এ সংকট সন্ধিক্ষণে ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল হিসেবে যে সব সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু হয়, শীয়ারা তাদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে অবশ্য এটি নিছক ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শীয়াদের উৎপত্তি ও বিকাশ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যবহ বিষয়।

শীয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়

শীয়া আরবি ভাষার শব্দ। এর অর্থ A group of people; a group of devoted supporters বা দল কিংবা সম্প্রদায়। ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলীর সমর্থকগণ শীয়া নামে পরিচিত। তবে এই সমর্থকগণের প্রতি হযরত আলী বা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীর কোনো ধরনের সমর্থন বা সহযোগিতা ছিল না। যে কারণে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পূর্ব পর্যন্ত শীয়াগণ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার দুঃসাহস করেনি। কারবালায় আলী পুত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড শীয়াদের রাজনৈতিক যাত্রা অনিবার্য করে তোলে। পরবর্তীতে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় দলটি অসংখ্য ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধারা থেকে তাঁরা কেউ-ই বের হয়ে আসতে পারেননি।

শীয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

১. **আলীর সমর্থকবৃন্দের গোপন অসন্তোষ ও আন্দোলন :** হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা পদে নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচনই শীয়া আন্দোলনের বীজ বপন করে। মহানবী (স.) তাঁর ইন্তিকালের আগে তাঁর কোনো উত্তরসূরি নির্বাচিত করেননি বা নিয়োগ দিয়ে যাননি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়ে তিনি উত্তরসূরি মনোনয়ন বা নির্বাচন থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর কুরাইশ বংশ এবং মদীনার অনেক লোকের বিশ্বাস ছিল হযরতের চাচাত ভাই ও জামাতা হযরত আলী খলীফা নির্বাচিত হবেন। বংশগত প্রভাব এবং আত্মীয়তাগত নৈকট্যতার জন্য লোকেরা তাঁর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার

Scanned by CamScanner

ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রথমে খলীফা নির্বাচিত হন আবু বকর (রা.)। এরপর পর্যায়ক্রমে হযরত উমর ও উসমান (রা.) খলীফা মনোনীত হন। এই মনোনয়নগুলোর প্রতিটিতে আলীর (রা.) সমর্থকবৃন্দ প্রথমবারের চেয়েও অধিকতর হতাশ হন। তাদের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়। ব্যক্তিগতভাবে আলী (রা.) প্রতিজন খলীফার প্রতিই একান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তাঁদের দেয়া সব প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তাছাড়া তিন খলীফার প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আবু বকর ও উমর (রা.) ছিলেন হযরতের শ্বশুর, উসমান (রা.) ছিলেন জামাতা। ইসলাম প্রচারে তাঁদের প্রত্যেকের অবদান অবিস্মরণীয় ছিল। ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত, স্বার্থান্বেষী কলুষ-কালিমা তাদেরকে কখনো এতটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি। যে কারণে প্রথম পর্যায়ে তো নয়ই এমনকি চতুর্থ খলীফা হিসেবেও নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত আলী (রা.) মোটেই লালায়িত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর সমর্থকবৃন্দ ভীষণ মনক্ষুণ্ন ছিলেন। আলীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য তারা একটি গোপন আন্দোলন শুরু করেন।

২. **ইবনে সাবার দুরভিসন্ধি :** হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে আলীর সমর্থকগণ অত্যন্ত সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বিশেষত হযরত উসমান (রা.)-এর কোমল শাসনের সুযোগ পেয়ে মুসলিমদের দলে অনেক অমুসলিমও নামেমাত্র ধর্মান্তরিত হয়ে ভিরে যায়। তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের দলে সম্পৃক্ত হয়ে তাদেরকে আরো বেশি বিভেদের পথে ঠেলে দেয়া। মুসলিম জাহানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়। ইবনে সাবাহ ছিল এমন একজন লোক যে-সে ছিল মূলত ইহুদি। ইহুদিবাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সে আলীর সমর্থকদের সঙ্গে মিশে যায়। খিলাফতের অবৈধ দাবিদার হিসেবে সে উসমানকে উচ্ছেদের আহ্বান জানায় এবং আলীর খিলাফতের পক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করে, যা কোনোক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না। ইবনে সাবাহ এইভাবে উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে খ্যাপিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত খলীফার নির্মম হত্যাকাণ্ডে সে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করে। আলীর সমর্থকরা এ হত্যাকাণ্ডকে তাদের বিজয় মনে করে খুশি হয়ে ওঠে। যে কারণে বিপথগামী অনেক ইতিহাসবিদের ধারণা, হযরত আলীও হয়তো এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জানতেন। প্রকৃতপক্ষে এসব সঠিক নয়। বরং আলী স্বয়ং তাঁর সন্তানদের খলীফার নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও উসমান হত্যাকাণ্ড শীয়াদের রাজনৈতিক উদ্ভবের পথ খুলে দেয়।

৩. **সিফফিনের যুদ্ধ ও যুমার সালিশ :** উসমান (রা.)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর হযরত আলী মুসলিম জাহানের খলীফা মনোনীত হন। উমাইয়া গোত্রের

Scanned by CamScanner

লোকেরা এ মনোনয়নকে সন্দেহ করতে থাকে। তারা সিরিয়ার প্রাদেশিক উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে হযরত আলীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সিফফিন নামক স্থানে ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। যুদ্ধে মুয়াবিয়া যখন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন সে কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্শার সঙ্গে কুরআন বেঁধে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। হযরত আলীর অধিকাংশ সেনাপতি সন্ধির বিপক্ষে থাকলেও গণদাবি মেনে আলী সন্ধির প্রস্তাব মেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। যুমায় সালিশ বসে। আলীর পক্ষে আবু মূসা আশআরী ও মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনে আস (রা.) সালিশ নিযুক্ত হন। ব্যাপক আলোচনা শেষে দুই সালিশ খিলাফত থেকে আলী-মুয়াবিয়া দু'জনেরই দাবি প্রত্যাহার করে নতুন খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সম্মত হন। আলোচনা অনুসারে আশআরী আলীর দাবি প্রত্যাহার করেন কিন্তু আমর মুয়াবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করেন। কূটনৈতিক এ পরাজয়ে আলীর সমর্থকবৃন্দ আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর কিছুদিন পর খারিজীদের হাতে আলী (রা.) নিহত হলে তাঁর সমর্থকদের রাজনৈতিক উত্থানের গতি ত্বরান্বিত হয়।

৪. **কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড :** মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়ারা ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ইসলাম পরিপন্থি রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিম বিশ্বের শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজিদ। হযরত আলীর পুত্রদ্বয় হযরত হাসান ও হুসাইন এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অধিকাংশ সাহাবী রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরোধিতা করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খিলাফতের অবৈধ দখলদার ইয়াজিদের আনুগত্য অস্বীকার করলেন। ফলে এখানেও সঙ্ঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কূটকৌশলী ইয়াজিদ হাসান (রা.)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। হুসাইন (রা.) সপরিবারে কূফা যাত্রার সময় ইয়াজিদ বাহিনী তাঁকে কারবালা নামক প্রান্তরে অবরোধ করে। এখানে ১০ মুহররম তারিখে হুসাইন (রা.)-কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বস্তুত হযরত হুসাইনের হত্যাকাণ্ডই শীয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উত্থান নিশ্চিত করে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি যথার্থই বলেছেন, "তাঁর পিতার রক্তের চেয়ে হুসাইনের রক্ত শীয়া সম্প্রদায়ের বীজ বলে প্রমাণিত হয় এবং ১০ মুহররম শীয়া মতবাদ জন্ম লাভ করে।" (The blood of Al-Husaen, even more than that of his father, proved to be the seed of the 'Shiite Churcu'. Shiism was born on the tenth of Muharram. – Prof. P.K. Hitti, History of the Arabs, p.181)

Scanned by CamScanner

শীয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ

১. **উমাইয়া শাসনামলে শীয়া আন্দোলন :** হিযাজে হযরত আলী ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক অনেক থাকলেও তাঁরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু পারসিকগণ উমাইয়া শাসনে ক্ষিপ্ত হয়ে শীয়াদের সঙ্গে যোগ দিলে পারস্যে শীয়া মতবাদ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাদের চেষ্টায় শীয়ারা ঐশী নিযুক্ত ইমাম ও অবতারবাদকে নিজেদের অন্যতম মূল মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ইরাক ও পারস্যে শীয়া মতবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুখতার শীয়াদের নেতা নির্বাচিত হন। তারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। জাবের যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে শীয়ারা বিজয়ী হন। যুদ্ধে জয়ের পর কারবালা হত্যাকাণ্ডের নায়ক ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ, সিমার প্রমুখ উমাইয়া সেনাপতিকে শীয়ারা নৃশংসভাবে হত্যা করে কারবালার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

২. **গোপন রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্য পরিচালনা :** শীয়াদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় মক্কার উমাইয়া শাসক মুসাবের সঙ্গে। এ যুদ্ধে শীয়ারা পরাজিত হন। তাদের নেতা মুখতার নিহত হয়। মুখতারের নিহত হওয়ার পর শীয়ারা সামরিক দিক থেকে অসংগঠিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। উমাইয়াদের প্রবল প্রতিরোধ ও নির্যাতনের মুখে তারা গোপন রাজনৈতিক পক্ষ হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

৩. **আব্বাসীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা ও আফ্রিকা গমন :** উমাইয়া শাসনের শেষভাগে শীয়ারা আব্বাসীয় আন্দোলন সমর্থন করে। মূলত শীয়াদের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে নতুন রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা শীয়াদের জন্য উমাইয়াদের চেয়েও অধিকতর কঠিন নিপীড়ন নীতি গ্রহণ করেন। শীয়াদের বেশকিছু অভ্যুত্থানের চেষ্টা অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়। ফলে শীয়ারা আব্বাসীয় শাসন এলাকা থেকে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকা চলে যেতে বাধ্য হয়।

৪. **বর্তমান বিশ্বে শীয়াদের অবস্থা :** উত্তর আফ্রিকায় ইমাম হোসেনের অন্যতম বংশধর ইদ্রিসের নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীন শীয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের দেশে দেশে শীয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংগঠিত করার কাজে এ রাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে মরক্কোর রাজবংশ ইদ্রিসীয় বংশেরই উত্তরসূরি বলে প্রবলভাবে ধারণা করা হয়। তবে শীয়া অধ্যুষিত জনপদ হিসেবে বিশ্বে এখনো পারস্য বা ইরানই উজ্জ্বল অবস্থানে রয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাকের কিছু কিছু অঞ্চল শীয়া অধ্যুষিত হলেও সমগ্র দেশে তাদের প্রভাব সামান্যই। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে শীয়াদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

Scanned by CamScanner

৫. **শীয়াদের বিভিন্ন দল-উপদল :** ক্রমবিকাশের ধারায় শীয়ারা বেশকিছু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরা মূলত জায়েদিয়া, ইসনা আশারিয়া ও সাবিয়া বা ইসমাইলিয়া শীয়া নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই দলগুলোর আরো অনেক উপশ্রেণি তৈরি হয়। এদের মধ্যে দারাজিয়া, গুপ্তঘাতকদল, ইখওয়ানুস সাফা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত ইসলামে বিভেদের যে রাজনীতি তাতে শীয়ারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শীয়ারা ছাড়া আর কোনো দলই এভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থন ও বিভক্তি পোষণ করেনি। এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষ্যণীয় যে, শীয়ারা হযরত আলীর সমর্থক ছিলেন, তাঁর বংশধরদেরও সমর্থক ছিলেন, কিন্তু শীয়াদের কাজের প্রতি হযরত আলী বা তাঁর বংশধর কারো সমর্থন ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির ধর্মতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক বিকাশের ধারায় শীয়ারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে, যা কোনোক্রমেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না।

শীয়াদের মূলনীতি/ মতবাদ

শীয়াদের মূলনীতি বা মতবাদ তাদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক দর্শনের বহিঃপ্রকাশ– যদিও শেষদিকে এসে তারা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিচয় বাদ দিয়ে কেবল ধর্মীয় দল হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। তাদের মূলনীতি হলো :

১. **কালিমা :** শীয়ারা কালিমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (স.)-এর সঙ্গে আরো একটি বিশেষ তাৎপর্যবহ অংশ জুড়ে দেয়। এ কালিমার শেষে তারা বলে 'ওয়া আলী খলীফাতুল্লাহ।' যার অর্থ হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল এবং হযরত আলী হলেন আল্লাহর খলীফা। আলীর উচ্চ মর্যাদা এবং খিলাফতে তাঁর একক দাবির বৈধতা প্রমাণের জন্য শীয়ারা এ অংশটুকু জুড়ে দিয়ে থাকেন।

২. **ইমামত :** শীয়া মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ইমামত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা। শীয়ারা বলেন, সাধারণ কোনো মুসলিম তার নিজ যোগ্যতায় কখনোই নেতা হতে পারবে না। নেতা হবেন কেবল এমন ব্যক্তি যারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বংশধর। এ হিসেবে হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)-এর উত্তরসূরি ছাড়া আর কেউ ইসলামী খিলাফতের ইমাম নির্বাচিত হতে পারবেন না। ইমামত একান্তভাবে হযরত আলীর উত্তরসূরিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ তিনি ও ফাতেমার ঔরসে জন্ম নেয়া উত্তরসূরি ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কোনো উত্তরসূরি ছিল না। সুতরাং ইমামত কোনো যোগ্যতার অর্জন নয়, বরং জন্মগতভাবে এ যোগ্যতা কেবল মুহাম্মদ (স.) বা হযরত আলীর উত্তরসূরিগণ লাভ করবেন।

Scanned by CamScanner

৩. **খিলাফত :** শীয়াদের মতে, ইসলামী খিলাফতের একমাত্র যোগ্য অধিকারী হলেন হযরত আলী। কিন্তু তাঁকে বঞ্চিত করে পর পর তিনবার অন্য লোকেরা ইসলামী খিলাফতের সমর্থক নির্বাচিত হয়েছেন। শীয়া বিশ্বাস অনুসারে, এ কাজ ছিল অত্যন্ত ও জঘন্য ও গর্হিত। যে কারণে তারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর নির্বাচিত তিন খলীফাকে অবৈধ এবং খিলাফতের অন্যায্য দাবিদার বলে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে শীয়ারা উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীকে খিলাফতের অবৈধ অধিকারী ঘোষণা করেন। প্রথম দিকে শীয়ারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের সমর্থন করলেও চূড়ান্তভাবে আব্বাসীয়রা তাদের সঙ্গে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করে। এরপর তারা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে এবং মরক্কো গমন করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন।

৪. **খলীফা নির্বাচন :** শীয়ারা খলীফা নির্বাচন সমর্থন করেন না। তাদের মতে, মানুষের খলীফা নির্বাচনের কোনো অধিকার বা ক্ষমতা নেই। কেননা একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের যোগ্যতা নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে মূল্যায়নের ক্ষমতা রাখে না। এতে করে তার পক্ষে সঠিক নির্বাচনের পরিবর্তে ভুল নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি নানা রকম মানবিক দুর্বলতা তো মানুষের রয়েছেই। এসব কারণে মানুষের নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ইমাম বা খলীফা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। আল্লাহ নির্বাচিত সেই নেতা মুসলিম জাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেতা হবেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত ইমাম হচ্ছেন হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণ। চরমপন্থি শীয়ারা ইমামকে 'আল্লাহর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি' হিসেবে মেনে চলেন।

৫. **ইমাম মাহদী :** কিয়ামতের আগে ইমাম মাহদী আগমন করবেন এবং ইসলাম বিরোধী সব কার্যক্রম নির্মূল করে সমগ্র পৃথিবীতে আবারো ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন, শীয়ারা এ কথা প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন। অবশ্য ইসনা আশারিয়া পন্থি শীয়াদের মতে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ আল-মুন্তাযিরই হলেন 'মাহদী'। তিনি সত্যিকার ইসলাম পুনরুদ্ধার, সমগ্র বিশ্বজয় এবং কিয়ামতের পূর্ববর্তী সহস্রাব্দের সূচনা করার জন্য আবির্ভূত হবেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আলীর বিশেষ বংশধর সম্পর্কে শীয়াদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণির বিশ্বাস, হযরত আলীর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে আল্লাহ তা'আলা গোপনে জীবিত রেখেছেন। তিনিই নির্দিষ্ট সময়ে ন্যায় ও সত্যের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'মাহদী' বা সত্যপথের দিশারী হিসেবে আবারো আবির্ভূত হবেন।

Scanned by CamScanner

৬. **আলী ও তাঁর বংশধরগণের মর্যাদা :** শীয়াদের বিশ্বাস, হযরত আলী (রা.) মহানবী (স.)-এর কাছ থেকে সরাসরি আধ্যাত্মিক শক্তির আলোক রশ্মি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর শরীরে আল্লাহর গৌরবের পবিত্র রশ্মি নিপতিত হয়েছিল। এ আলোক রশ্মি হযরত আলী (রা.)-এর পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। বংশানুক্রমে আল্লাহর এই পবিত্র রশ্মি প্রাপ্ত ইমামগণ পুরোপুরি নির্দোষ ও নিষ্পাপ। শীয়াগণ এ কারণেই বিশ্বাস করেন, ইমামগণ জন্মগতভাবে নিষ্পাপ ও নির্দোষ এবং ইমামতের জন্য এমন নির্ভুলতা ও নিষ্পাপ্যতা অপরিহার্য। আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরগণ এই দুটি গুণে গুণান্বিত, কেননা তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ইমাম।

৭. **একাধিক ইমাম :** শীয়ারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইমামত বা নেতৃত্ব অবিভাজ্য। এ কারণে তাদের মতে, একই সময়ে দু'জন ইমামের আবির্ভাব অসম্ভব। বিশ্বমুসলিমকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য গোটা বিশ্বে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ইমাম– যিনি কি-না আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত, তিনি একাধিক হতে পারবেন না। তাঁর অধীনে বিভিন্ন এলাকায় ইমামতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁর অনুগত লোক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কিন্তু মূল ইমাম কোনোক্রমেই একজনের বেশি হতে পারবে না।

৮. **কুরআনের নিত্যতা :** শীয়ারা বিশ্বাস করে, কুরআন চিরন্তন গ্রন্থ নয়। কেননা কুরআন যদি চিরন্তন গ্রন্থ হয় তাহলে চিরন্তন সত্তা একাধিক হয়ে পড়ে, যা মহান আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা পরিপন্থি। তাই তারা কুরআনকে অবিনশ্বর গ্রন্থ মনে করেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের এ মত মুসলিম দার্শনিক সম্প্রদায় মুতাযিলাদের মতের অনুরূপ।

৯. **ইজমা-কিয়াসের গ্রহণযোগ্যতা :** শীয়াদের মতে, কুরআন মাজীদ ও তাদের হাদীস সব জ্ঞানের আধার। মানুষের সব সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকেই গ্রহণ করা সম্ভব। তাই ইজমা ও কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো ইসলামী আইনের উৎস হতে পারে না। এ কারণে ইজমা-কিয়াসের আলোকে যে কোনো প্রকারের রায় দেয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। কোনো মুসলিম এ কাজ করতে পারেন না। তাই শীয়াদের দৃষ্টিতে ফিকহশাস্ত্র একটি অবৈধ শাস্ত্র, ফিকহী মাযহাবও অবৈধ মাযহাব। কেননা এর ভিত্তিই অবৈধ বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১০. **হাদীস মূল্যায়নে ভিন্ন মত :** শীয়ারা হাদীসকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও মহানবী (স.)-এর সব বাণীকে তারা হাদীস মনে করেন না। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়শা সিদ্দীকা, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবী (রা.) যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, শীয়ারা সেগুলোকেও হাদীস হিসেবে মানেন না।

Scanned by CamScanner

কেননা তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন, যে সব হাদীসে মহানবী (স.) হযরত আলীর খিলাফতের ঘোষণা দিয়েছেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ সে সব হাদীস গোপন করেছেন। এ কারণে তারা হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহকেই কেবল মেনে চলেন। এর বাইরে তাদের ইমামদের বাণীকে তারা হাদীস হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

১১. **শেষ নবী :** শীয়াদের অন্যতম প্রধান উপদল ইসমাঈলিয়া শীয়ারা মনে করেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী নন। শীয়াদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম ইসমাঈল হলেন শেষ নবী। এ কারণে শীয়াগণ হযরত আলীসহ তাঁর সব উত্তরসূরির নামের শেষে রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবর্তে নবীগণের মতো 'আলাইহিস সালাম' শব্দ যুক্ত করেন।

১২. **সামাজিক বিধান :** শীয়াদের মতে, নিকাহে মুতআ বা অর্থের বিনিময়ে সাময়িক সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিবাহ বৈধ। তারা জুমআর সালাত একাকী আদায় করা, জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলা ইত্যাদি মতবাদে একান্তভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন।

১৩. **ইমামগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা :** দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শীয়াদের মতে, ইমামগণ জগতের নিয়ন্ত্রক। মানুষের মুক্তি তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। শীয়ারা তাদের ইমামদের জন্য প্রার্থনার বিশেষ ফর্মূলা ও নামাযের বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারণ করেন। রবিবারের প্রার্থনা হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনের যুহরের নামায ইমাম হাসানের জন্য, আসরের নামায ইমাম হুসাইনের জন্য, মাগরিবের নামায জয়নুল আবেদীনের জন্য এবং ইশার নামায মুহাম্মদ আল-বাকিরের জন্য নির্দিষ্ট। শীয়ারা মনে করেন, ইমামকে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে হবে।

১৪. **ধর্মতত্ত্ব :** ইসমাঈলি শীয়াদের মতে, বিপদ ও অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্যক্তি তার নিজের ধর্ম-বিশ্বাস গোপন করতে পারে। জীবনের ওপর যেখানে হামলা উপস্থিত হয়েছে সেখানে আত্মরক্ষার জন্য শীয়ারা শাসক সম্প্রদায়ের ধর্মমত মেনে নিয়েছেন। তারা বলেন, ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে মহানবী (স.) ও তাঁর অনুসারীগণ জীবনরক্ষার তাগিদে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস গোপন রেখেছেন।

১৫. **ধর্মাচার :** শীয়াদের অন্যতম উপদল ইসমাইলি শীয়ারা বিশ্বাস করে, ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার, বাহ্য অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের মধ্যে ধর্ম নিহিত নেই। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনই মূল ধর্মাচার। তাই ধর্মকে প্রথাসর্বস্ব না করে একে আন্তরিক বিশ্বাসে পরিণত করাই শ্রেয়।

Scanned by CamScanner

বস্তুত শীয়াদের মূলনীতি ও মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। বিশেষত শেষ নবী, ইমামত, খলীফা নির্বাচন, প্রথম তিন খলীফা, হাদীস-ইজমা-কিয়াস সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তারা ইসলামের মূলনীতি ও বিধানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন। এসব কারণে সুন্নী মুসলিমদের সঙ্গে শীয়াদের সঙ্ঘাত প্রায় শাশ্বত রূপ লাভ করেছে।

শীয়াদের বিভিন্ন উপদল

হযরত আলীর বংশধরগণের মধ্যে কে ইমামতের যোগ্য বা কাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করা হবে– এমন প্রশ্নে শীয়ারা বিভিন্ন সময়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে নানা উপদল জন্ম লাভ করে। এই উপদলগুলো প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন–

ক. জায়েদিয়া শীয়া;

খ. ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শীয়া এবং

গ. সাবিয়া বা ইসমাঈলিয়া শীয়া বা সপ্ত ইমামে বিশ্বাসী শীয়া।

ক. জায়েদিয়া শীয়া : ইয়েমেনের জায়েদীগণ এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীনের পুত্র জায়েদের অনুসারী বলে তাদেরকে জায়েদিয়া বলা হয়। অন্য দুটি দলের তুলনায় এরা অনেকটা উদারপন্থি এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের খানিকটা কাছাকাছি। তাদের ইমামতের ধারা হলো হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, জয়নুল আবেদীন ও ইমাম জায়েদ। তারা মুহাম্মদ আল-বাকেরকে ইমাম স্বীকার করেন না। জায়েদিয়াদের মতে, হযরত আলীর বংশধরদের মধ্যে কে ইমাম হবেন, তা নির্বাচন করার অধিকার মুসলিম উম্মার রয়েছে। তারা বিশ্বাস করেন, বিশেষ ক্ষেত্রে হযরত আলীর বংশের বাইরের লোকও ইমাম হতে পারেন। এ হিসেবে তারা পূর্ববর্তী তিন খলীফাকে অবৈধ মনে করেন না। একই সময় একাধিক দেশে দূরত্বের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ইমাম থাকাকে তারা সমর্থন করেন। সততা ও জ্ঞানের পাশাপাশি জায়েদিয়াদের মতে ইমামের সাহসিকতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

খ. ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শীয়া সম্প্রদায় : এরা শীয়াদের অন্যতম প্রধান উপদল। বারোজন ইমামের ইমামতে বিশ্বাস করেন বলে এই দলটি সাধারণভাবে দ্বাদশ ইমামপন্থি শীয়া হিসেবে পরিচিত। তাদের মতানুসারে এই ১২ জন ইমাম হলেন–

১. হযরত আলী;

২. ইমাম হাসান;

৩. ইমাম হুসাইন;

Scanned by CamScanner

জাবারিয়া
[Jabarites]

ইসলামে ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় উদ্ভবের প্রারম্ভিক কালে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে জাবারিয়া সম্প্রদায় অগ্রজ, কাদারিয়া সম্প্রদায় তাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র। পরবর্তীতে মুসলিম দর্শনে স্বাধীন চিন্তার বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটার নেপথ্যে এ সম্প্রদায় দুটিই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বিলুপ্ত হলেও মুসলিম দর্শনে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

খোদার স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতির পরিণতি হিসেবে প্রথম ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় হিসেবে জাবারিয়ারা যাত্রা শুরু করে। জাহম বিন সাফওয়ান (মৃ.-৭৪৫ খ্রি.) এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আরবি 'জবর' শব্দ হতে জাবারিয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। জবর অর্থ বাধ্যতা, নিয়তি, অদৃষ্ট। অদৃষ্টবাদ বা খোদার স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাসের কারণে এ সম্প্রদায় জাবারিয়া বা অদৃষ্টবাদী হিসেবে পরিচিত হয়।

জাবারিয়াগণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষমতা পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাদের মতে, প্রত্যেক কাজ খোদার কাছ থেকে আসে। খোদাই ঠিক করে দেন, কে কী কাজ করবে। কোনো কাজ পছন্দ করা বা তা বাস্তবে রূপায়ণও আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। কাজ নির্বাচন করা বা কাজ করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। সে পুরোপুরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনস্থ। খোদা যেমন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জড়বস্তুর মধ্যে কর্মশক্তি সৃষ্টি করেন, তেমনি মানুষের মধ্যেও তিনি ক্রিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এ কারণে মানুষের পুরস্কার এবং শাস্তিও আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাধীন বিষয়। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দেবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। জাহম বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো কাজ করে না। রূপকার্থে সূর্য যেমন আলো দেয় কিংবা যন্ত্রের চাকা চলে তেমনিভাবে বলা হয় মানুষও কাজ করে।"

জাবারিয়া চিন্তাবিদগণ তাদের মতের সমর্থনে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেন। যেমন–

ক. "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ হলেন সবকিছুর ওপর শক্তিমান। (সূরা বাকারা : ২৮৪)

খ. "হে রাসূলুল্লাহ (স.), কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে হিদায়াত দান করা আপনার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।" (সূরা বাকারা : ২৭২)

Scanned by CamScanner

গ. "হে আল্লাহ! আপনি রাজত্ব, কর্তৃত্ব, মালিকানা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা মুলক দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা মুলক ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন। সব কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"

– (সূরা আলে ইমরান : ২৬)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, জাবারিয়াগণ তাদের মতের সমর্থনে এভাবে যত আয়াত উল্লেখ করেছেন সবগুলো আয়াতই আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা প্রসঙ্গে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, কর্মফল ভোগ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যে সব ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করেননি। মতবাদ প্রকাশ ও প্রমাণে এ জাতীয় ভূমিকার জন্য জাবারিয়ারা নিজেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি দল গোঁড়া জাবারিয়া। এদের মতে, "কোনো অর্থেই মানুষ কাজ করে বা মানুষের কাজের কোনো শক্তি আছে তা বলা যায় না। বরং মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার দাস অক্ষম সৃষ্টি মাত্র।" অপর দলটি এর চেয়ে খানিকটা নরমপন্থি কিন্তু তারাও অদৃষ্টবাদী। তাদের মতে, মানুষের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা তার কাজের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এভাবে মতদ্বৈততার কারণে জাবারিয়াদের মধ্যে তিনটি উপদল জন্ম নেয়। এগুলো হলো জাহামিয়া, নাজ্জারিয়া ও জিরারিয়া। বিভিন্ন গৌণ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকার ব্যাপারে তাদের কোনো মতবিরোধ ছিল না।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কারণ

'জাবারিয়া' আরবি পরিভাষা। 'জাবর' শব্দমূল থেকে কথাটির উদ্ভব হয়েছে। অভিধানে 'জাবর' হলো অদৃষ্ট, নিয়তি, বাধ্যতা। তাই 'জাবারিয়া' হলো এমন একটি বিশ্বাসের ধারক দার্শনিক মতবাদ, যাতে নিয়তিকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। খোদার স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্বীকৃতি হতে জাবারিয়া মতবাদের উৎপত্তি ঘটে। অদৃষ্ট বা নিয়তিতে আল্লাহর নিরঙ্কুশ জবরদস্তি বা স্বেচ্ছাচার সংশ্লিষ্ট মতবাদ বলে এ মতবাদ জাবারিয়া নামে অভিহিত। 'জাহম বিন সাফওয়ান' (মৃ-৭৫৪ খ্রি.) এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এ মতবাদে মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন বাধ্য প্রাণি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুসলিম দর্শনে জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির নেপথ্যে বেশকিছু কারণ প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন–

১. **প্রাক-ইসলামী বিশ্বাস :** প্রাক-ইসলামী যুগে অন্যান্য জাতির মতো আরব জাতিও অদৃষ্টে বিশ্বাস করত। তাদের মতে, খোদা এক স্বেচ্ছাচারী শাসক। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু তাঁর সৃষ্টি এবং মানুষ তাঁর হাতের পুতুল; মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন মানুষ তাই করে। ইসলাম গ্রহণের পরও অনেকের মধ্যে এ ধারণা জাগরুক থাকে যা পরিণতিতে জাবারিয়া মতবাদের জন্ম দেয়।

Scanned by CamScanner

২. **উমাইয়া শাসকদের দুরভিসন্ধি :** কুশাসক ও পাপাচারী উমাইয়া শাসকরা নিজেদের দুষ্কর্ম ও পাপাচারের বৈধতা দেয়ার জন্য এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। নিজেদের দুষ্কৃতির যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য তারা প্রচার করত যে, আল্লাহর কাছে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায়, তার কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। কাজেই উমাইয়া শাসকগণ যা করছেন সে জন্য তাদেরকে দায়ী করা যায় না। অমোঘ নিয়তিই তাদেরকে দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। উমাইয়া শাসকগণ নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং অবৈধ কাজের বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে জাবারিয়া মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

৩. **পবিত্র কুরআনের যথার্থতা প্রমাণ :** জাবারিয়ারা তাদের দৃষ্টিতে কুরআন মাজীদের যথার্থতা প্রমাণের জন্য এ মতবাদ গড়ে তোলেন। তারা বলেন, কুরআনে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের অসংখ্য ঘোষণা রয়েছে। যদি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা মেনে নেয়া হয় তাহলে পরম ইচ্ছাময় আল্লাহর ক্ষমতা খর্ব করা হয়। কুরআনের আয়াতের এমন ভুল ব্যাখ্যাই একদল লোককে জাবারিয়া মতবাদ প্রবর্তনে উৎসাহী করে এবং পরিণামে এ মতবাদের পথচলা শুরু হয়।

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে জাবারিয়া মতবাদ

জাবারিয়া মতবাদে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। তাদের মতে, "God is all powerful, so man can have no power, no freedom of will, no liberty of volition and no choice of action." তাই প্রত্যেক কাজ আসে খোদার কাছ থেকে। সুতরাং, মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী নয়। কেননা মানুষের কাজ করার কোনো শক্তি নেই কিংবা ইচ্ছারও স্বাতন্ত্র্য নেই। মতের সপক্ষে জাবারিয়াগণ বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন–

১. **আল্লাহর ইচ্ছায় সব হয় :** পৃথিবীর সবকিছু সম্পাদিত হয় আল্লাহর ইচ্ছায়। তিনি সব শক্তির আধার। এখন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা মেনে নিলে তো আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়া মিথ্যে হয়ে যাবে। অথচ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।" (সূরা আলে ইমরান : ২৬)

২. **ইচ্ছায় সুপথে চলা যায় না :** মানুষ ইচ্ছে করলেই সুপথ লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন, যাকে ইচ্ছা ভুল পথে পরিচালনা করেন। এজন্যই নবী (স.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন, "তাদের সুপথ দেয়ার দায়িত্ব আপনার নয় বরং আল্লাহ যাকে খুশি হিদায়াত দান করেন।" (সূরা বাকারা : ২৭২) কাজেই বুঝা যায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই।

Scanned by CamScanner

৩. **পরকালীন দায়মুক্তি :** মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকার জন্যই সে তার কর্মের জন্য দায়ী নয়। মূলত এ কারণেই পারলৌকিক পরিণতিকে সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে, "অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।" যদি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকত, তাহলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতেন না বা যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতেন না। বরং মানুষের ইচ্ছা অনুসারে সম্পাদিত কর্মের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করতেন।

৪. **আল্লাহর জ্ঞান :** মানুষ কী করবে বা কী করবে না তা অনাদিকাল থেকেই মহান আল্লাহ তা'আলা অবহিত আছেন। আল্লাহ আগে থেকেই জানেন মানুষ কী করবে আর কী করবে না। যদি আল্লাহর আগে থেকেই জেনে যান তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় থাকল? আল্লাহর আগে থেকে জানাই প্রমাণ করে, মানুষের সব কাজ অনাদিকালেই মহান আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ কেবল সে নির্ধারণ অনুসারে কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাবে।

৫. **আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা :** জাবারিয়াগণ আরও বলেন, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা মেনে নিলে বুঝতে হবে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কারণ সে তার ইচ্ছা শক্তিতে কাজ বেছে নিচ্ছে এবং তা সম্পাদনও করছে। যার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা নন। অথচ ইসলামে একাধিক সৃষ্টিকর্তার ধারণা সুস্পষ্টভাবে ঈমান ও আমল পরিপন্থি। তাই জাবারিয়াগণ মন্দ ও ভালো'র একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে মেনে নিয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন।

সমালোচনা

জাবারিয়াগণ ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রশ্নে যে বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, আমাদের বিবেচনায় তা অভ্রান্ত নয়। কেননা কুরআনের যে বাণীগুলো দ্বারা তারা বিষয়টি প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন সে বাণীগুলো আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে। মানুষের ইচ্ছা-কর্মের সঙ্গে এগুলোর দূরতম সম্পর্কও নেই। জাবারিয়াগণ ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত আয়াতগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রমাণবাহী এ আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। তারা যে সব যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন– সেগুলোও নিতান্তই ঠুনকো। কেননা আল্লাহ অনাদিকাল থেকে অবহিত আছেন যে, মানুষ অমুক কাজ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে এবং অমুক কাজ ইচ্ছামাফিক করবে, আর এরূপই তিনি ইচ্ছা করেন। কাজেই কাজ করা, না করা মানুষেরই নিজের ইচ্ছাধীন থেকে যাচ্ছে। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলেই যে মানুষ কর্মের স্রষ্টা হয়ে যাবে– এটিও ঠিক নয়। কেননা কর্ম হলো মানুষের অর্জন। সুতরাং ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করলেও আল্লাহর সবকিছুর স্রষ্টা হওয়া মিথ্যে হয়ে যায় না।

Scanned by CamScanner

কাদারিয়া
[Qadarites]

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম দর্শনের প্রথম যুক্তিবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় কাদারিয়াদের যাত্রা শুরু হয়। বিখ্যাত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ হাসান বসরী মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই কাদারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তার বীজ বপন করেন। তাঁর শিষ্য মাবাদ আল-জুহানী (মৃ.-৬৯৯ খ্রি.) এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আরবি কাদার শব্দ হতে কাদারিয়া শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। কাদার অর্থ শক্তি। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষের স্বাধীন শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে তাদেরকে কাদারিয়া বলা হয়। কাদারিয়াগণ জাবারিয়াদের বিপরীতে ঘোষণা করেন, "মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি রয়েছে। মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী। এ কারণেই মানুষ মন্দ কাজের জন্য শাস্তি এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পেয়ে থাকে। ইচ্ছাশক্তি না থাকলে মানুষকে কাজের জন্য দায়ী করা এবং সে হিসেবে পুরস্কার দেয়া ও শাস্তি দেয়া জুলুম হতো। মহান আল্লাহ কোনোক্রমেই এ জাতীয় জুলুম করতে পারেন না। এ মতের সমর্থনে কাদারিয়াগণ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেন। যেমন–

ক. "যে ব্যক্তি কোনো পাপ কাজ করবে, সে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে তার নিজের ক্ষতির জন্যই। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী।" (সূরা নিসা : ১১১)

খ. "নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে।" (সূরা রাদ : ১১)

গ. "কেউ যদি বিন্দুমাত্র সৎ কাজ করে থাকে তাহলে সে তা দেখবে, আর কেউ যদি বিন্দুমাত্র মন্দ কাজ করে থাকে, তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো চিন্তাবিদ মাঝে মাঝে মানবীয় এলাকার বাইরে চলে গিয়েছেন এবং মানুষের ক্ষেত্রেও দু-একটি ঐশীশক্তি প্রয়োগ করেছেন। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ নির্বাচনের ব্যাপারে তারা মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়েছেন। এসব কারণে কাদারিয়াগণ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। রাষ্ট্রপক্ষও তাদেরকে দমনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা করে। মাবাদ আল-জুহানীকে হত্যা করা হয়।

Scanned by CamScanner

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কারণ

জাবারিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাদারিয়া মতবাদ জন্মলাভ করে। মা'বাদ আল-জুহানী (মৃ-৬৯৯ খ্রি.) এ মতবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুশাসন ও কুকর্মের জন্য উমাইয়াদের অভিযুক্ত করলে আব্দুল মালিক তাকে প্রাণদণ্ড দেন। তাঁর পরে ইউনুস আল-আসওয়ারী ও গিমনে আল-দামেস্কী এই মতবাদের বিকাশ ঘটান। কিন্তু নুমানীর মতো, দামেস্কীকেও প্রাণদণ্ড দেয়া হলে এ মতবাদের অগ্রগতি থেমে যায়। 'কাদারিয়া' শব্দটি আরবি 'কদর' থেকে নিষ্পন্ন। 'কদর' অর্থ শক্তি। এ মতবাদের ধারকরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করেন বলে তাদের 'কাদারিয়া' বলা হয়।

জাবারিয়াদের বিকৃত মতবাদই কাদারিয়াদের মতো একটি চরমপন্থি নিরঙ্কুশ ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার মতবাদ পোষণকারী দলের উদ্ভব ঘটায়। জাবারিয়া মানুষকে অসহায় সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করে মানুষের পাপ কাজের বিশেষত উমাইয়া শাসকদের দুষ্কৃতিতে পর্যন্ত আল্লাহর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করলে তার প্রতিবাদে মুক্ত চিন্তার কাদারিয়াদের যাত্রা শুরু হয়। তারা উমাইয়া শাসকদের পাপাচারী ঘোষণা দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করেন।

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কাদারিয়া মতবাদ

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কাদারিয়াগণ জাবারিয়াদের চরম বিরোধী মতবাদের প্রবক্তা। সে কারণে জাবারিয়াগণ যেখানে মানুষকে সম্পূর্ণ পরাধীন মনে করে সেখানে তারা মনে করে, কর্মে ও ইচ্ছায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন। তারা বলেন, "Man is the master of his own works." নজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার সপক্ষে তাদের যুক্তিগুলো হলো–

১. **আল্লাহ যুলুম করেন না :** আল-কুরআনে এসেছে, "কেউ যদি অণু পরিমাণ 'ভালো' করে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে, আবার কেউ যদি বিন্দুমাত্র 'মন্দ' করে তার পরিণামও তাকে ভোগ করতে হবে।" এখন মানুষের যদি ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতাই না থাকে তাহলে তাকে শান্তি বা শাস্তি দেয়া কি জুলুম হবে না? অথচ আল্লাহ তা'আলা সব জুলুম থেকে পবিত্র!

২. **আল্লাহ মন্দ কাজ করেন না :** মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে মানুষের সব কাজের দায় সরাসরি আল্লাহর ওপর পতিত হবে। সে হিসেবে আল্লাহই হবেন ব্যাভিচারী, মদ্যপ বা চোর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হলেন এসব মন্দ কাজের ধারণা থেকে পূত-পবিত্র। কাজেই মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা অস্বীকারের উপায় নেই।

Scanned by CamScanner

৩. **আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সার্থকতা :** সর্বোপরি মানুষের যদি ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে আল্লাহর কোনো আদেশ-নিষেধই তার ওপর প্রযোজ্য হবে না। কেননা, মানুষের তো কোনো এখতিয়ারই নেই, সে ভালো বা মন্দ করবে কীভাবে? সুতরাং ইচ্ছা ও কর্মে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা থাকা বা না থাকা প্রসঙ্গে জাবারিয়ারা যে বক্তব্য দিয়েছেন তা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় কাদারিয়াদের বক্তব্যও। কেননা মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা নেই– এটি ঠিক নয়। প্রকৃত সত্য হলো, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তার প্রকৃতি সম্পর্কে কাদারিয়াগণ যেমন বক্তব্য দিয়েছেন তাও সঠিক নয়। বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পর্যায়ে কাদারিয়াগণ কিছুটা বাড়াবাড়িও করেছেন। যেমন– মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে গিয়ে তারা তাকে 'কর্মের স্রষ্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী আকিদা এ বিষয়টি সমর্থন করে না। কেননা মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা নয়। কিন্তু সে তার কর্মের জন্য দায়ী। কারণ, কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে এবং এজন্যই তাকে পারলৌকিক পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর মানুষকে কর্মের 'স্রষ্টা' বলা না হলেই যে আল্লাহর ওপর সব কাজের দায়িত্ব পতিত হবে এটিও ঠিক নয়; কেননা সব কাজের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ কিন্তু তিনি কাজ করেন না। কাজের কর্তা হলো মানুষ। সুস্থ বিবেচক স্রষ্টার পরিবর্তে কর্তাকেই দায়ী করবে। যেমন- কালি প্রস্তুতকারীকে আমরা 'কালো' বলি না, বরং যাতে কালি লেগেছে তাকে 'কালো' বলি এবং এজন্য প্রস্তুতকারীকে দায়ী করা হয় না। সর্বোপরি, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষের ওপর আল্লাহর বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হবে কিন্তু তা তাকে কর্মের স্রষ্টায় পরিণত করবে না।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্নে জাবারিয়া ও কাদারিয়া এ উভয় সম্প্রদায়ই চরমপন্থি। জাবারিয়া ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকার ব্যাপারে আর কাদারিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তাদের অভিমতের মাঝামাঝি। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু কর্ম তার সৃষ্টি নয় বরং অর্জন। স্বাধীন ইচ্ছায় আল্লাহর সৃষ্টি বিভিন্ন কর্ম সে অর্জন করে মাত্র এবং স্বাধীন ইচ্ছার জন্য সে কর্মের দায় বহন করে।

মুসলিম দর্শনে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্ব

জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান মুসলিম দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে

Scanned by CamScanner

মুতাযিলা
[Mutazilites]

মুসলিম দর্শনে স্বাধীন চিন্তার পথিকৃত মাবাদ আল-জুহানীর (মৃ.-৬৯৯ খ্রি.) নির্মম হত্যাকাণ্ড এ ধারার দর্শনকে অনেকখানি প্রভাবিত করে সত্য কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে কাদারিয়া মতবাদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে এ মতবাদেরই অধিকতর সংশোধিত রূপ হিসেবে প্রবলভাবে যুক্তিবাদী মতাদর্শ মুতাযিলাদের যাত্রা স্বাধীন চিন্তায় বিপুল উদ্যম ও গতি সঞ্চার করে। পর্যায়ক্রমে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে আবার কালের আবর্তে মতবাদটি বিলুপ্তও হয়ে যায়।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কোনো মতবাদের প্রতিক্রিয়া বা বিশেষ কোনো ধর্মতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায় নয়। এমনকি জাবারিয়াদের মতো রাষ্ট্রশক্তির অন্যায় কর্মকে সমর্থন কিংবা কাদারিয়াদের মতো বিরোধিতার জন্যও এ মতবাদের উৎপত্তি হয়নি। বরং কালের অমোঘ পরিণতি হিসেবেই স্বাধীন চিন্তার ভিন্নতর এ ধারাটির যাত্রা শুরু হয়।

১. **আল-বসরী ও একটি বিশেষ প্রশ্ন :** মুসলিম দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায় একটি প্রভাবশালী যুক্তিবাদী সম্প্রদায় হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ মতবাদের উদ্ভবের পেছনে আছে একটি বিশেষ ঘটনা। যেমন– খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইমাম হাসান আল-বসরী (৬৪২-৭২৮ খ্রি.) ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস, দার্শনিক। সমকালীন সব সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞানানুসন্ধানী মানুষ তাঁরই দ্বারস্থ হতো। স্বাধীন চিন্তানায়ক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রবর্তক হিসেবে ইতোপূর্বে তিনি কাদারিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। সে কারণে তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল অপরিসীম। এ সময়ে এক ব্যক্তি জানতে চান যদি কোনো ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তাহলে সে কি কাফের হয়ে যাবে না-কি মুসলিমই থাকবে?

২. **আল-বসরী ও ওয়াসিলের জবাব :** আল-বসরী বলেন, কবীরা গুনাহকারী কাফের হবে না, বরং সে হবে মুনাফেক বা কপট মুসলিম। কিন্তু সুবিজ্ঞ ইমামের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা উস্তাদের এ বিশ্লেষণ অস্বীকার করেন। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিটি মুসলিম থাকবে না। তবে সে কাফেরও হবে না, বরং এমন ব্যক্তি কুফরি ও ইসলামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। অর্থাৎ 'মুযাবযাবিনা বায়না যালিকা' বা 'আল-মানযিলু

Scanned by CamScanner

বায়নাল মানযিলাতায়ন' তথা সে ঈমান ও কুফরির মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে। তার অবস্থান হবে ঈমান ও কুফরের মাঝখানের মঞ্জিলে।

৩. **আল-বসরীয়া প্রত্যাখ্যান ও ওয়াসিলের দলত্যাগ :** ইমাম হাসান আল-বসরী ওয়াসিল বিন আতার এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর একান্ত অনুসারীরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ওয়াসিলের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। ফলশ্রুতিতে ওয়াসিল হাসান বসরীর দলত্যাগ করে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রচার করতে থাকেন। বক্তব্য প্রচার ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি তিনি যুক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া শুরু করেন। কখনো কখনো তিনি ধর্মীয় বিধানাবলিকে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের জন্যও নানা যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করেন।

৪. **মুতাযিলা নামকরণ :** ইমামের দলত্যাগ করে ওয়াসিল মসজিদের এক প্রান্তে তাঁর নতুন এ মতবাদের প্রচার শুরু করেন। কিছু মুক্তপন্থি সংস্কারবাদী সতীর্থরা তাঁর এ কাজে উৎসাহী হয়ে এ নতুন পদ্ধতির জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হন। এতে করে ইমাম আল-বসরী বলেন, "ইতিযাল আন্না' বা সে আমাদের দলত্যাগ করেছে।" ইমামের এ বক্তব্য থেকেই ওয়াসিল বিন আতা প্রতিষ্ঠিত মতবাদটি মুতাযিলা নামে অভিহিত ও পরিচিত হয়। যার সাধারণ অর্থ হলো দলত্যাগী।

৫. **ভিন্ন মত :** অধ্যাপক ন্যালিনো অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যে সময়ে খারিজীরা বলত পাপী মুসলিম কাফের আর মুরজিয়ারা বলত তারা মুসলমানই। মতবাদ হিসেবে এ দু'টি মতবাদ চরম কাঠিন্য বা শৈথিল্য দোষে দুষ্ট। মুতাযিলারা এ দ্বিবিধ মতবাদ ত্যাগ করে এক নতুন মতবাদ পোষণ করেন। বস্তুত পুরনো মতবাদ পরিত্যাগ বা বর্জনের জন্যই তারা মুতাযিলা বা পরিত্যাগকারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। নতুন মতে তারা পাপী মুসলিমকে যেমন কাফির ঘোষণা দিতে নারাজ তেমনি তাকে মুসলিম হিসেবে মেনে নিতেও প্রবল আপত্তি। এ জন্য তারা নতুন একটি মতবাদ ও মঞ্জিল ঠিক করেন, যার অবস্থান হবে ঈমান ও কুফরির মাঝখানে। যদিও সাধারণ মুসলিম সহজেই তাদের এ মতবাদ বুঝতে বা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ এবং সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক ন্যালিনোর বিশ্লেষণটি যথার্থ মনে হয়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। এর চেয়ে বরং প্রথম মতবাদটিই অধিকতর ইতিহাস সমর্থিত। এ কারণে ঐতিহাসিক সমর্থনের অভাবে যুক্তিসিদ্ধ মতটি ত্যাগ করে দর্শনের ঐতিহাসিক-বিশ্লেষকগণ দ্বিতীয় মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তারা বলেছেন, খারিজী ও মুরজিয়াদের মত ত্যাগ করে যদি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জন্ম হতো তাহলে তারা মধ্যপন্থি হতেন। কিন্তু তারা মধ্যপন্থি না হয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতার ব্যাপারে বরং নতুন ধারার চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন।

Scanned by CamScanner

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের কর্মপদ্ধতি, নীতি, বক্তব্য ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে সাধারণভাবে মনে হয়, কুরআনের শিক্ষা থেকে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে তারা কুরআন থেকে আবেগ-বিবর্জিত ও বিশ্বাসের প্রবল প্রভাবে প্রভাবিত কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাদের শিক্ষা পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ। কুরআন মাজীদের যৌক্তিক ব্যাখ্যাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য। কুরআনে আলোচিত নানা সমস্যা যেমন খোদার গুণাবলি, ইচ্ছার স্বাধীনতা, কুরআনের নিত্যতা বা সৃষ্টিতত্ত্ব, খোদার দর্শনের অসম্ভবতা, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সৃষ্টি রহস্য, ভালো-মন্দের সৃজন ইত্যাদি মুতাযিলা চিন্তাবিদগণকে স্বাধীন চিন্তার এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে। কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক গিব এ প্রসঙ্গেই বলেছেন, "মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানকালে এ গোষ্ঠীর চিন্তাবিদগণ বুদ্ধিবাদীদের চেয়ে বরং কঠোর নীতিনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং একান্তভাবে কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।"[১]

অন্যান্য মুসলিম দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতো মুতাযিলাদের উত্থানের যাবতীয় রসদ কুরআন মাজীদ থেকেই সংগৃহীত। একইভাবে তাদের বিকাশও একান্তভাবে কুরআনের শিক্ষা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পার্থক্য কেবল গ্রহণের পদ্ধতি ও বাস্তবায়নের নীতির কারণে। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতগণ ফাতেমীয়দের অধীনেই লেখাপড়া করেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মধ্যমপন্থি মুতাযিলাদের মতবাদ খলীফা আলী ও তাঁর অদূরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত মুহাম্মদ (স.)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।"[২]

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মূলত মুসলিম দর্শনে যুক্তিবাদী ধারার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা। যেমন–

১. **গবেষণাগত অগ্রগতি :** দার্শনিক-ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় হিসেবে উত্থানের পর মুতাযিলাদের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। এ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির ইতিহাসে ওয়াসিল বিন আতা ও আমর ইবনে উবায়েদ বিশেষ অবদান রাখেন। খোদাবাদ নির্মূলের জন্য অনেক গবেষণা করেন এবং খোদার অস্তিত্বের পক্ষে জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করেন।

Scanned by CamScanner

২. **উমাইয়া শাসনামলে :** প্রথমদিকে বিরূপ পরিস্থিতি থাকলেও উমাইয়া শাসনের শেষভাগে মুতাযিলা সম্প্রদায় শক্তিশালী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং রাজদরবারে স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ মুতাযিলা মতবাদের অন্যতম সমর্থকে পরিণত হন। ওয়ালিদ যখন মদ্যপান ও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হন তখন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অন্যায়ের অবসান ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়াজিদ তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধে ওয়ালিদ নিহত হন এবং ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন হন। এতে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বিকাশে বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

৩. **সাধারণ পর্যায়ে ব্যাপক বিরোধিতা :** রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করতে সক্ষম হলেও মুতাযিলারা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলিম এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। ধর্মতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে মুতাযিলাদের প্রবল বাক-বিতণ্ডা চলতে থাকে। দু'পক্ষের মধ্যে বিতর্ক সভা নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তাদের বিরোধিতা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **আব্বাসীয় শাসনামলে :** আব্বাসীয় শাসকগণ আরবীয় রীতির স্থলে পারসিক রীতি প্রচলন করলে মুতাযিলাদের বিকাশ লাভের পথ আরো সুগম হয়। আল-মনসুর (৭৭৫ খ্রি.) মুতাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিলে তারা প্রধান দার্শনিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। হারুন অর রশীদের শাসনামলে বার্মাকি সম্প্রদায় একান্তভাবে মুতাযিলা মতবাদের উন্নতির জন্য কাজ করেন। মুতাযিলা চিন্তাবিদ আবুল হুদায়েল আল্লাফ ও ইব্রাহীম ইবনে সাইয়ার নাজ্জাম এ সময় মুতাযিলা মতবাদের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

আল-মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রি.) রাজত্বকালে মুতাযিলাদের সর্বোচ্চ বিকাশ সাধিত হয়। রাষ্ট্রের সব প্রান্তে তাদের মতবাদ রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে গৃহীত হতে থাকে। এ জন্য খলীফা রাষ্ট্রীয় প্রভাব ব্যবহার করেন। এতে সাময়িকভাবে মুতাযিলা মতবাদের প্রসার লক্ষ করা গেলেও পরিণতিতে তা মুতাযিলাদের পাশাপাশি আব্বাসীয় ক্ষমতা অবসানেরও পটভূমি রচনা করে।

মামুনের মৃত্যুর পর আব্বাসীয় শাসক মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রি.) ও ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রি.) মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। তারা কাজী আহম্মদ বিন দাউদ নামের মুতাযিলা চিন্তাবিদকে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

৫. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পতন :** ওয়াসিকের মৃত্যুর পর মুতাযিলাগণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ব্যর্থ হন। বরং পরবর্তীকালের শাসকগণ অতিরিক্ত যুক্তিবাদিতার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য মুতাযিলাদের নির্যাতন শুরু করেন। কোনো কোনো আব্বাসীয় খলীফার হাতে

Scanned by CamScanner

মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ অমানবিক নির্যাতন ভোগ করেন। ইতোমধ্যে আশারিয়া মতবাদের উত্থান ঘটে। জাবারিয়াদের অতিরিক্ত অদৃষ্টবাদিতা, মুতাযিলাদের অতিরিক্ত যুক্তিবাদিতার বিপরীতে আশারিয়াদের মধ্যমপন্থি মতবাদ সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে আল-গাযালি সূফীবাদকে মুসলিম দর্শনের সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করে দেয়ার প্রেক্ষাপটে মুতাযিলা মতবাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি হ্রাস পায়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মতবাদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বস্তুত মুসলিম জাতির চিন্তা-ধারার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মতবাদগত দুর্বোধ্যতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সরাসরি বিরোধিতার কারণে সাধারণ মুসলিমগণ মতবাদটিকে গ্রহণ না করলেও দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বিশেষত আশারিয়া ও সূফী মতবাদের উত্থানে এবং মুসলিম দর্শনের কার্যকর প্রয়োগে মুতাযিলা সম্প্রদায়কেই প্রকৃত দিশারি বলা যেতে পারে।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মতবাদ

মুতাযিলা সম্প্রদায় মুসলিম দর্শনের যুক্তিবাদী সম্প্রদায়। প্রতিটি সমস্যা ও প্রশ্নকে তারা যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। সব ক্ষেত্রেই তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় বিধানকে যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস এককভাবে মুতাযিলাদের চেয়ে বেশি কেউ-ই প্রদর্শন করেননি। তাদের প্রধান প্রধান মতবাদগুলো হলো,

১. **সিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলারা আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার মধ্যে প্রথম বক্তব্যটি সিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে। মুতাযিলারা আল্লাহর একত্ব ও চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের জন্যই তারা আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলিতে বিশ্বাসী নন। তাদের মতে, আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের সঙ্গে তাঁর গুণাবলি থাকার ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ এক, কাজেই তাঁর কোনো সিফাত থাকা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ চিরন্তন সত্তা। আর চিরন্তন সত্তার গুণাবলিও চিরন্তন। এখন আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁর সিফাত বা গুণ থাকার বিষয়টি মেনে নেয়া হয় তাহলে আল্লাহর পাশাপাশি আরও অসংখ্য চিরন্তন গুণাবলির অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে যা আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা।

মুতাযিলারা বলেন, আল্লাহর গুণাবলি চিরন্তন না হয়ে যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে তিনিও পরিবর্তনাধীন বা পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। কিন্তু এটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা আল্লাহ চিরন্তন, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় সত্তা। তাই

Scanned by CamScanner

আল্লাহর সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণাবলির অস্তিত্ব থাকা এক কথায় নিছক কল্পনাবিলাস মাত্র। ওয়াসিল বিন আতা এজন্যই বলেছেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন বিভিন্ন গুণের এক অস্পষ্ট ঐক্য"।

২. **কুরআনের নিত্যতা :** আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ে মুতাযিলাদের দ্বিতীয় মতবাদ হলো, আল-কুরআন সৃজিত। এটি চিরন্তন ও শাশ্বত কোনো বাণী নয়। মতের সপক্ষে তারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন–

ক. আল-কুরআন সৃজিত না হয়ে যদি নিত্য হয় তাহলে Eternal Being বা চিরন্তন সত্তা হয় দু'টি। একটি স্বয়ং আল্লাহ আর অপরটি হলো আল-কুরআন। কিন্তু এটি হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ হলেন একমাত্র চিরন্তন সত্তা। কুরআন চিরন্তন হলো তিনি আর একমাত্র চিরন্তন সত্তা থাকেন না যা তাঁর তাওহীদের ধারণা পরিপন্থি। সুতরাং মেনে নিতে হয় কুরআন সৃজিত।

খ. কুরআন বিশেষ স্থান, কাল ও স্থানীয় ভাষায় সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "নিশ্চয়ই কুরআন বিশ্বজাহানের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। রুহুল আমীনের মাধ্যমে এটিকে নাজিল করা হয়েছে।" কুরআন আরবের বিশেষ এলাকায় নির্ধারিত মানবগোষ্ঠীর ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। চিরন্তন গ্রন্থের এমন হওয়া সম্ভব নয়।

গ. কুরআনে অতীত ঘটনা, আধুনিক ভাষার শব্দ এবং সমকালীন জীবনবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতের অনেক চরিত্রও এতে চলে এসেছে। বিশেষত পরিবর্তনশীল আরবি ভাষার পরিবর্তনীয় নানা শব্দ, ভাষারীতির নানা উপস্থাপনা, মানবীয় ব্যাকরণসম্মত বক্তব্য কুরআনের চিরন্তন হওয়ার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক। এটি চিরন্তন গ্রন্থ হলে এ বিষয়টি সম্ভব হতো না। সুতরাং কুরআন সৃজিত বিষয়।

৩. **আল্লাহর দর্শন :** আল্লাহর একত্ববাদ সংরক্ষণের স্বার্থে মুতাযিলাগণ বলেন, ইহজগত বা পরজগতে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন সম্ভব নয়। আবুল হুদায়েল আলাফ বলেন, "আমরা আল্লাহকে কেবল আমাদের মনের চোখে দেখতে পারি, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনের মাধ্যমেই আমরা কেবল তাঁকে জানতে পারি।" (We would see God only with our minds eye i.e. we would know Him only through the heart.)। এ মতের অনুকূলে তাদের যুক্তি-প্রমাণগুলো নিম্নরূপ :

ক. আল্লাহ বলেন, "দৃষ্টিসমূহ আমাকে বেষ্টন করতে পারে না, বরং আমিই দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করে রাখি।"(কুরআন)

খ. মূসা বললেন, 'আমি আপনাকে দেখতে চাই।' আল্লাহ বলেন, 'তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পারবে না।' (কুরআন)

Scanned by CamScanner

গ. কোনো বস্তুকে দেখতে হলে তাকে আকৃতিবিশিষ্ট হতে হবে। যার আকৃতি থাকে তিনি একক এবং অসীম হতে পারেন না। কেননা আকৃতি তা যত বড়ই হোক, তার শেষ অবশ্যই থাকবে। অথচ আল্লাহর কোনো শেষ নেই। তিনি অসীম। এ কারণে তিনি আকৃতিবিশিষ্ট হতে পারেন না। আর আকৃতিবিশিষ্ট হতে পারেন না বলেই আল্লাহর দর্শন অসম্ভব।

৪. **ইচ্ছার স্বাধীনতা :** মুতাযিলা মতবাদে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। এটি মুতাযিলা মতবাদের মূল মতবাদ হিসেবে গণ্য এবং সব মতবাদের ভিত্তি। মুতাযিলা বিশ্বাসে মানুষ কর্ম সৃষ্টি ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। কেননা মানুষের কর্ম সৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষত খারাপ কাজ সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলে খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পবিত্রতা বিঘ্নিত হয়। যেমন– ব্যভিচারিতা, চুরি, মদ্যপান, সমকামিতা প্রভৃতি অন্যায় কাজগুলো যদি আল্লাহর ইচ্ছায় সৃজিত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য মানুষকে দায়ী করা চলবে না এবং পরকালীন শাস্তিও দেয়া যাবে না। পাশাপাশি আল্লাহ বিবেচিত হবেন ব্যাভিচারী, চোর, মদ্যপ বা সমকামী হিসেবে। কিন্তু আল্লাহর পবিত্র সত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিধায় মানুষের সর্বাত্মক ও সামগ্রিক ইচ্ছার স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে।

৫. **অমঙ্গল ও দুঃখের স্রষ্টা :** মুতাযিলারা বলেন, আল্লাহ ইচ্ছে করলে যে কোনো কাজ করতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবের বিপরীত কোনো কাজ করেন না। যে জন্য জগতের সবকিছুই কল্যাণকর। এ বিষয়ে তাদের পরবর্তী বক্তব্য হলো আল্লাহ মন্দ করতে পারেন না। কাজেই অমঙ্গল ও দুঃখের স্রষ্টা তিনি নন। জগতের অনিষ্ট ও দুঃখের জন্য মানুষই দায়ী। মানুষের কৃতকর্মই জগতে অকল্যাণের সূচনা করে। এ বিষয়ে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা হলো, "তোমার যা কিছু ভালো অর্জন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমার অর্জনের মধ্যে যা কিছু খারাপ তা তোমার নিজস্ব তরফ থেকে।" (আল-কুরআন)

৬. **পরকালীন প্রতিদান :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তাই পরকালের জিন্দিগিতে পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করা এবং পাপীকে শাস্তি দেয়া তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। এটা না করে তিনি পারেন না। তাঁর পক্ষে কোনো পুণ্যবানকে শাস্তি দেয়া বা পাপীকে পুরস্কৃত করা অসম্ভব। কেননা তিনি প্রতিশ্রুতিমূলক ঘোষণায় বলেছেন–

ক. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকর্ম করেছে সুনিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাত।

খ. যারা অবিশ্বাস করেছে আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে সুনিশ্চিতভাবেই তারা চিরদিন থাকবে নরকে।

Scanned by CamScanner

কাজেই মন্দ কাজ করেছে এমন কাউকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর জন্য সঙ্গত নয় এবং তিনি তা করবেনও না।

৭. **পাপী মুসলমানের অবস্থান :** মুতাযিলী মতবাদে কবীরা গুনাহকারী মুসলিমকে কাফের বলা হয় না কিংবা মুনাফিকও বলা হয় না। এমনকি এটাও বলা হয় না যে, এ জাতীয় লোক মুসলিমই থাকবে। এক্ষেত্রে তারা এক নবতর মতবাদের প্রবর্তক। তাদের বিবেচনায় পাপী মুসলিম কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবে। যেমন– 'আল-মানযিলাতু বায়নাল মানযিলাতায়ন।' এর অর্থ হলো, পাপী মুসলিম যেমন মুসলিম নয় তেমনি সে কাফিরও নয়। কেননা মুসলিম হলে সে পাপ করত না আবার কাফির হলে সে আল্লাহকে অবিশ্বাস করত। অথচ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আবার পাপও করে। কাজেই তার জন্য একটি নবতর মঞ্জিল স্থির করা আবশ্যক। সে মঞ্জিল ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী মঞ্জিল।

৮. **ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন :** মুতাযিলারা মনে করেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরযে আইন বা অনিবার্য কর্তব্য। কেননা এ সংক্রান্ত নির্দেশে কাউকে নির্দিষ্ট করা হয়নি বা কোনো ছাড় দেয়াও হয়নি। যেমন– আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ করো।" (আল-কুরআন)

৯. **জগত সম্পর্কিত ধারণা :** মুতাযিলাদের মতে, পূর্ব থেকে জগৎ ছিল। তবে তা ছিল নিশ্চল, নিস্তব্ধ অবস্থায়। আল্লাহ নিজস্ব ক্ষমতাবলে জগৎকে গতিশীল করেছেন। অর্থাৎ মুতাযিলাদের বিবেচনায় Creation of the world বা উৎপত্তির দুটি স্তর। প্রথম স্তর জগৎ Potential form এ ছিল। পরে তা Actual form লাভ করেছে। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে মুতাযিলাগণ বলেন, জগত অনাদিত্য বা অবিনশ্বর। তা পূর্ব থেকে ছিল, পরেও থাকবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এর নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করবেন মাত্র। সম্পূর্ণ ধ্বংস করবেন না।

১০. **বস্তুর প্রকৃতি :** মুতাযিলারা বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেশ করেন। তারা বলেন, বস্তু হচ্ছে একটি নিছক ধারণা। ধারণার বাইরে বস্তু অস্তিত্বহীন। অস্তিত্ব বস্তুর একটা গুণ। এটা বস্তুর থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। অস্তিত্ব থাকলে বস্তুকে সত্তা বলা যায়, অন্যথায় বস্তু কোনো সত্তা নয়।

এ আলোচনা থেকে মুতাযিলা সম্প্রদায় ও তাদের মূল মতবাদ সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা যায় তা পুরোটাই যুক্তিবাদী। অতিরিক্ত যুক্তিনির্ভরতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ইসলামের মূল চেতনা ও বিশ্বাস পরিপন্থি এবং অগ্রহণযোগ্য।

Scanned by CamScanner

আশারিয়া
[Asharites]

ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা থেকে আশারিয়া মতবাদের উৎপত্তি। ধর্ম ও দর্শন– এই দ্বিবিধ চিন্তাপদ্ধতির ওপরে তাই এ মতবাদ প্রবক্তাদের নির্ভরতা। মূলত এ মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদীদের চরম যুক্তিমনস্ক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিপদ ও বিভ্রান্তি থেকে ধর্মকে রক্ষা করা। এজন্যই নিজেদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এ মতবাদের প্রবর্তক-ধারকরা যেমন বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করেছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আবার দার্শনিক চিন্তা-ধারা খণ্ডনের জন্য ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আশ্রয়ও নিয়েছেন। আশারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ মুসলিম দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আশারিয়াদের পরিচয়

মুসলিম দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষকগণ বলেছেন, মুতাযিলা মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম দর্শনে আশারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। হিজরি তৃতীয় শতকে মুসলিম বিশ্ব পরস্পর বিরোধী দু'টি চিন্তাশীল দলে ভাগ হয়ে যায়। যার একটি চরম যুক্তিবাদী, অন্যটি গোঁড়া ধর্ম-বিশ্বাসী। যুক্তিবাদীরা প্রত্যেক ধর্মীয় প্রশ্নকেই যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করতেন। এরা মুতাযিলা। আর ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মের সরাসরি বক্তব্যের বাইরে একচুলও এগুতে নারাজ। এরা মুরজিয়া। এই দুই মতবাদের চরমভাবাপন্ন মতবাদ মুসলিম মন-মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে একটি নতুন মধ্যপন্থি মতবাদ জন্মের পূর্বাভাস সূচিত হয়। আবুল হাসান আল-আশআরী (র.) এ সম্ভাবনায় বাস্তব রূপ দেন। তাঁর নামানুসারেই মধ্যপন্থি এ মতবাদটি 'আশারিয়া' মতবাদ নামে পরিচিত হয়।

আশারিয়াদের উৎপত্তি

মুতাযিলা মতবাদের মতো আশারিয়া মতবাদের উৎপত্তিও চমকপ্রদ এক জিজ্ঞাসা এবং গুরু-শিষ্যের মতানৈক্য নিয়ে। তবে এক্ষেত্রে মুতাযিলারা পূর্বেই প্রেক্ষিত রচনা করে রেখেছিলেন। পরে আল-আশআরী অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্র এক মতবাদের উদ্ভব ঘটান। আশারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

Scanned by CamScanner

১. **মুতাযিলীদের প্রতিক্রিয়া :** হিজরি তৃতীয় শতকে মুসলিম বিশ্ব পরস্পর বিরোধী দুটি চিন্তাশীল দলে ভাগ হয়ে যায়। এর একটি গোঁড়া ধর্ম-বিশ্বাসী খারিজী শীয়া-ঘরানার, অপরটি চরম যুক্তিবাদী মুতাযিলা মতবাদ। যুক্তিবাদীরা প্রত্যেক ধর্মীয় প্রশ্নকেই যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করতেন। তাদের চরম যুক্তিনির্ভরতা মানুষের ধর্মানুশীলন ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রক্রিয়াটি জটিল করে তুলেছিল। এর প্রেক্ষিতে গোঁড়া বিশ্বাস ও চরম যুক্তিবাদের মাঝামাঝি একটি নতুন প্লাটফর্ম তৈরির আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

২. **আল-আশআরী ও একটি জিজ্ঞাসা/আশারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কারণ :** আবুল হাসান আল-আশআরী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর অধঃস্তন পুরুষ। ২৭০ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে দর্শনশাস্ত্রের ওপর ব্যাপক অধ্যয়ন শেষে আল-আশআরী মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষদিকে মুতাযিলা বিরোধী আন্দোলন যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে সে সময়ে আল-আশআরী তাঁর শিক্ষাগুরু আবু আলী যুবাইকে পরকালের কর্মফল সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন হলো এক পরিবারের তিন ভাই। তাদের একজন ধর্মভীরু, একজন কাফির, আর একজন অবুঝ শিশু। তারা এক সঙ্গে মারা গেল। এখন তাদের পরকালীন পরিণতি কী হবে? আল-যুবাই জবাবে বললেন, "ধর্মভীরু ভাইটি জান্নাতে যাবে, কাফির ভাইটি যাবে জাহান্নামে এবং অবুঝ শিশুটি নাজাত পাবে কিন্তু শাস্তি বা পুরস্কার কিছুই পাবে না। সে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি নবতর মনজিলে অবস্থান করবে।"

আল-আশআরী জানতে চাইলেন, যদি নাবালক ভাই তার ধর্মভীরু ভাইয়ের মতো জান্নাত চায়, তবে তাকে কি তা দেয়া হবে?

যুবাই বললেন : 'না, দেয়া হবে না। কেননা, তার তো পুণ্য কর্ম নেই। ধর্মভীরু ভাই জান্নাত পেয়েছে পুণ্য কর্মের জন্য।'

আশআরী প্রশ্ন করলেন, 'নাবালক ছেলেটি যদি আল্লাহর কাছে এই দাবি করে যে, দীর্ঘ জীবন দিলে সেও পুণ্য করত। তাকে দীর্ঘ জীবন দেয়া হয়নি। সেটা তো তার দোষ নয়। তবে কেন জান্নাত দেয়া হবে না?'

যুবাই বললেন, 'আল্লাহ জানতেন দীর্ঘ জীবন দেয়া হলে নাবালকটি পাপ করবে, যে জন্য মৃত্যু দিয়ে তাকে পাপ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং তার জান্নাত দাবির অধিকার নেই। নাজাতই যথেষ্ট।'

আশআরী জানতে চাইলেন, 'তাহলে কাফির লোকটির দোষ কোথায়? সে তো বলতে পারে তাকে কেন অবুঝ শৈশবে মৃত্যু দেয়া হলো না? কেন তাকে

Scanned by CamScanner

পাপের জীবন দিয়ে জাহান্নাম দেয়া হলো?' আল-যুবাই এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন।

৩. **আশআরী মতবাদ :** আল-যুবাই যথার্থ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে আল-আশআরী মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করে নিজস্ব অভিমত প্রচার করতে থাকেন। তাঁর নামানুসারে তাঁর মতবাদ 'আশারিয়া মতবাদ' নামে খ্যাত হয়। মুতাযিলাপন্থি আশারি আশারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রনায়ক হিসেবে মুসলিম দর্শনের চিন্তাজগতে নতুন আলোড়ন তুললেন। তিনি শিক্ষাগুরু আবু আলী যুবাইয়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তর পর্বে গুরুকে নিরুত্তর করে দিয়ে তাঁকে হেয় বা কমজ্ঞানী প্রমাণ করেননি, সেই ইচ্ছা বা বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি বরং প্রমাণ করেছেন, সব প্রশ্নের উত্তর কেবল প্রজ্ঞার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। সব সমস্যার সমাধান বুদ্ধির মাধ্যমে করা যায় না। বরং একটি পর্যায়ে মানুষকে প্রত্যাদেশ ও স্বজ্ঞার ওপর নির্ভর করতে হয়। মানুষের জীবনে ব্যাখ্যাতীত অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। প্রত্যাদেশ ও স্বজ্ঞা ছাড়া এ ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মনীষী ওয়াট যথার্থই বলেন, "মানব জীবনের সামগ্রিক বাখ্যায় মানুষের ধারণা যথেষ্ট নয়; বিভিন্ন মানুষের ভাষ্যের তারতম্যের ক্ষেত্রে মানুষ যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না– বিশ্বাসকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।"[১]

আশারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কারণ

হিজরি তৃতীয় শতকে মুসলিম বিশ্ব পরস্পর বিরোধী দুটি চিন্তাশীল দলে ভাগ হয়ে যায়। এর একটি গোঁড়া ধর্ম-বিশ্বাসী খারিজী শীয়া-ঘরানার, অপরটি চরম যুক্তিবাদী মুতাযিলা মতবাদ। যুক্তিবাদীরা প্রত্যেক ধর্মীয় প্রশ্নকেই যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করতেন। তাদের চরম যুক্তিনির্ভরতা মানুষের ধর্মানুশীলন ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রক্রিয়াটি জটিল করে তুলেছিল। এর প্রেক্ষিতে গোঁড়া বিশ্বাস ও চরম যুক্তিবাদের মাঝামাঝি একটি নতুন প্লাটফর্ম তৈরির আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটি বিশেষ ঘটনা ও কারণ এই প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে আশারিয়া মতবাদের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয় এবং আবুল হাসান আশআরি এই প্রেক্ষাপটেই আশারিয়া মতবাদ প্রবর্তন করেন।

---

[১] Human conceptions are inadequate for the facts of human life. One cannot give a rational explanation of the differences between the fate of different ... simply accept. – W.M. Watt, *Free Will and Predestination*

Scanned by CamScanner

মতবাদ মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য দার্শনিক মতবাদ হিসেবে টিকে রয়েছে।

আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মতবাদ

আশারিয়ারা মুতাযিলাদের মতবাদ খণ্ডন করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে মুতাযিলা ও আশারিয়াদের প্রধান প্রধান ইস্যুগুলো একই, কেবল বক্তব্য ভিন্ন। যেমন–

১. **সিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর গুণাবলি ও তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদ অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা আল্লাহর পাশাপাশি কতগুলো চিরন্তন গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা একাধিক চিরন্তন সত্তার স্বীকৃতির নামান্তর। কাজেই তা তাঁর তাওহীদের বিরোধী। আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণার্থে মুতাযিলাগণ তাই আল্লাহর গুণাবলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন কিংবা আল্লাহর সত্তার সঙ্গে এগুলোকে অভিন্ন মনে করেন।

আশারিয়া মতবাদ অনুসারে আল্লাহর অবিনশ্বর সত্তার মতোই তাঁর গুণাবলিও অবিনশ্বর। তিনি বিভিন্ন অবিনশ্বর গুণাবলিতে ভূষিত। এসব গুণাবলি তাঁর সত্তার সঙ্গে অভিন্ন নয় বরং স্বতন্ত্র। কিন্তু এসব তাঁর একত্ব বা তাওহীদকে কোনো অংশেই ক্ষুণ্ন করে না। আল্লাহ তা'আলা জীবন, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন ও কথন এবং কুরআনে বর্ণিত আরও অসংখ্য পরস্পর বিরোধী গুণাবলিতে বিভূষিত। যেমন আল্লাহ ক্ষমাশীল ও শাস্তিদাতা, করুণাময় ও কঠোর প্রভৃতি। যখন বলা হয় 'আল্লাহ দয়াশীল' তখন আল্লাহর দয়াময়তা গুণকে অবিনশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গুণটি স্বতন্ত্র হওয়ার পরও তা কিন্তু নতুন কোনো আল্লাহর অস্তিত্বকে নির্দেশ করেনি। সুতরাং মুতাযিলাদের বক্তব্যে স্বতন্ত্র গুণাবলি আল্লাহর একত্বকে ক্ষুণ্ন করার কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানবিক গুণ বিন্যাসের মাধ্যমেও বিষয়টি বোঝা যায়। আমরা যখন বলি 'বশীর দয়ালু' এবং 'বশীর কৃপণ' তখন কিন্তু বশীরের আলাদা আলাদা দুটি সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনিবার্য হয় না। বরং একজন বশীরের মধ্যেই দয়ালু ও কৃপণতার গুণ অন্তর্নিহিত থাকে। সামান্য মানুষের ক্ষেত্রে এভাবে আলাদা সত্তার অধিকারী না হয়েও যদি গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য তো তা আরো অধিকতর সহজ ও সম্ভব।

২. **আল্লাহর দর্শন :** মুতাযিলাদের অভিমত অনুসারে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। কেননা আল্লাহর দর্শন সম্ভব হলে আল্লাহকে আকৃতিবিশিষ্ট হতে হবে। আর আল্লাহ যদি আকৃতিবিশিষ্ট হন, তাহলে তিনি কোনোক্রমেই অসীম হতে পারেন না।

Scanned by CamScanner

কেননা কোনো আকৃতিই অসীম হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হওয়ার কথা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছে, "মূসা (আ.) বলেন, প্রভু! আমি তোমাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলেন, তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না।" এ মতবাদের বিরুদ্ধে আশারিয়ারা বলেন, আল্লাহর দর্শন সম্ভব। কেননা আল্লাহ বিভিন্নভাবে তাঁর দর্শনের সম্ভাব্যতার অনুকূলে বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন তিনি এরকাদা করেছেন, "যে ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সাক্ষাৎ পেতে চায় সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে।" (আল-কুরআন) আল-হাদীসে মহানবী (স.) এরকাদা করেছেন, "পরকালে মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয় হবে আল্লাহর দিদার লাভ।"

এক্ষেত্রে আকৃতির বিষয়ে মুতাযিলাদের উত্থাপিত আপত্তির জবাব হলো, পার্থিব কোনো বিষয় দর্শনের জন্য তাদের এ আপত্তি যথার্থ। কিন্তু আল্লাহ পার্থিবতা-অপার্থিবতার ঊর্ধ্বে। যে জন্য এসব শর্ত পূরণ না করেও তিনি দর্শন সম্ভব করে তুলতে পারেন। আর তাঁর দর্শন অসম্ভব হলে তিনি মূসা (অ)-কে বলতেন, "আমি দেখা দেই না বা আমাকে দেখা সম্ভব নয়।" বরং তখন আল্লাহকে দেখার মতো অপার্থিব দৃষ্টিশক্তি না থাকার জন্যই তাঁকে বলা হয়েছে, তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না।

৩. **কুরআনের নিত্যতা :** কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি নাকি এটি একটি শাশ্বত অবিনশ্বর বিষয় সে সম্পর্কেও আশারিয়ারা মুতাযিলাদের বিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুতাযিলারা বলেছেন, কুরআন সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা এটিকে সৃষ্টি করেছেন। যে জন্য এর মধ্যে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও আধুনিক শব্দমালা পাওয়া যায়। কুরআন সৃষ্টি না হলে আল্লাহর একত্ব বিঘ্নিত হয়। কেননা তাহলে আল্লাহর পাশাপাশি আরও একটি অবিনশ্বর সত্তা অস্তিত্বশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু তা তো অসম্ভব। এক্ষেত্রে আশারিয়াদের বিশ্বাস হলো, কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট নয়। বরং অনাদি-অনন্তকাল থেকে তা ছিল আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে একত্ব হয়ে। পরবর্তীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা সুনির্দিষ্ট ভাষায় বিশ্বমানবের উপযোগী করে আল্লাহপাক তা পেশ করেছেন মাত্র। যে জন্য কাগজে-কলমে রক্ষিত এ কুরআন সৃষ্ট বটে কিন্তু 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে রক্ষিত কুরআন সৃষ্ট নয়। বরং আল্লাহর বাণী হিসেবে এগুলো তাঁর সত্তার মতোই অসৃষ্ট। কেননা আল্লাহর কালাম তাঁর সত্তার মতো অবিনশ্বর হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কুরআনে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আধুনিক শব্দমালার উপস্থিতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন, আল্লাহর কাছে সময় এক মূর্তমান বর্তমান। তাঁর কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনো ব্যাপার বিবেচ্য নয়। যে জন্য তাঁর বাণীতে ইতিহাস বা নতুন শব্দমালা থাকলেই তাঁকে সৃষ্ট বলার ধৃষ্টতা পোষণ করা উচিত নয়।

Scanned by CamScanner

৩. **ইচ্ছার স্বাধীনতা :** ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি। তবে আল্লাহপাক এসবের জন্য দায়ী নন। কেননা আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়ের শক্তি-স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ এই শক্তি স্বাধীনতা দিয়েই তাদের কর্ম সম্পাদন করে। যে জন্য কৃত-কর্মের দায়-দায়িত্ব মানুষকে বহন করতে হয় এবং এর জন্য পরকালে শাস্তি বা পুরস্কারের পরিণতি ভোগ করতে হয়। অর্থাৎ মুতাযিলারা যেমন খারাপ কাজকে পুরোপুরি মানুষের সৃষ্টি বলে অভিমত পোষণ করেন এবং ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতার মতো ব্যক্ত করেন, আশারিয়ারা তাদের বিরোধী মতবাদের প্রবক্তা। তাই আশারিয়া মতবাদে মানুষ চরম ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বা নিরেট অচেতন পদার্থ– কোনোটাই নয়। ভালো-মন্দ নির্ধারণের ক্ষমতা মানুষের আছে এবং মানব প্রবৃত্তির এ ক্ষমতার জন্যই কর্মসম্পাদনের দায়দায়িত্ব তার নিজের।

৪. **সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি :** আশারিয়াদের বিশ্বাসানুযায়ী যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত সত্য লাভ করা যায় না। বরং প্রকৃত সত্যের জ্ঞান লাভের অবিকল্প একমাত্র উপায় হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। যুক্তি ওহীর শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু পরম সত্য উদ্ঘাটনে একমাত্র উপায় হতে পারে না।

৫. **পরকালীন প্রতিদান :** আল্লাহ সৎ-অসৎ কর্মের যথাযথ প্রতিদান দিতে বাধ্য নন। এটা সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ারাধীন ব্যাপার। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন। কিন্তু ন্যায়বিচারের গুণে গুণান্বিত বলে আল্লাহ তা'আলা এ কাজটি সাধারণত বর্জন করেন। তিনি ভালো কাজের পুরস্কার দেন, মন্দ কাজে শাস্তি প্রদান করেন।

৬. **মিরাজ :** মহানবী (স.) স্বপ্নে বা অন্য কোনোভাবে নয় বরং সশরীরে মিরাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাঁর সরাসরি দিদার সংঘটিত হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে, "অতঃপর তাঁরা আরও নিকটবর্তী হলেন এমনকি তাদের মধ্যে ধনুক পরিমাণ ব্যবধান মাত্র রইলো।"

৭. **মৃতের জন্য প্রার্থনা :** আশারিয়া বিশ্বাসে মৃতদের জন্য দোয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের শাস্তি লাঘব হয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা একটি সওয়াবের কাজ।

৮. **রাসূলুল্লাহর শাফায়াত :** আশারিয়াগণ আখিরাতে পাপী মুসলিমদের জন্য মুহাম্মদ (স.)-এর শাফায়াত বা মধ্যস্থতা স্বীকার করেন। তাঁদের বিশ্বাসে প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই রাসূলের শাফায়াত অনিবার্য। তাঁর শাফায়াত ছাড়া কারো মুক্তি নেই এবং অনেক পাপী পর্যন্ত তাঁর শাফায়াতে মুক্তি পাবে।

Scanned by CamScanner

৯. **সাধ্যাতীত কর্ম :** আশারিয়া বিশ্বাসে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান বলে মানুষকে তিনি তার সাধ্যাতীত কাজেরও নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি রাহমানুর রাহীম বলে এটা করেন না। এর অর্থ এই নয় যে, সাধ্যাতীত কাজ চাপানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। বরং সাধ্যাতীত কাজ করার আদেশ দেয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু দয়াবান বলেই তিনি তা করেন না।

১০. **জগৎ সৃষ্টি রহস্য :** বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আশারিয়ারা পরমাণুবাদের প্রবক্তা। বিশ্বের সবকিছু পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট– এটাই এ মতবাদের মূল কথা। এ বক্তব্যের মাধ্যমে তারা মুতাযিলাদের মতবাদের বিরোধিতা করেন। কেননা মুতাযিলারা বলেছিল পূর্ব থেকেই নিশ্চল পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আশারিয়া সম্প্রদায় ধর্মীয় আকীদা-আমলকে যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখার সুমহান লক্ষ্য নিয়ে দর্শন চর্চায় নিবেদিত হয়েছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্যই ছিল, প্রচলিত অনৈতিক এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী দর্শনের অশুভ প্রভাব থেকে দর্শনকে এবং দর্শনে আগ্রহী লোকদেরকে রক্ষা করা। আশারিয়াদের ইতিহাস এবং মতবাদ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, আশারিয়াগণ তাঁদের সেই লক্ষ্য পুরোপুরি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আশারিয়াদেরকে মুতাযিলা মতবাদের প্রতিক্রিয়া বলা যায় কি-না

আশারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, মুতাযিলা মতবাদের বিভ্রান্তি, যুক্তিভিত্তিক দুর্বোধ্যতা, অতিরিক্ত যুক্তিবাদিতা, ধর্মীয় বিধানকে ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও হেয় করার মানসিকতা ইত্যাদি আশারিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট রচনা করে রেখেছিল। মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী আল্লাহর গুণাবলি, তাঁর দর্শন, কুরআনের নিত্যতা, মহানবী (স.)-এর মিরাজ, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা অতিরিক্ত যুক্তিবাদিতার কারণে এমন সব বক্তব্য প্রদান করে আসছিলেন যা অনেকাংশে কুরআন-হাদীস ও ইসলামের মৌলিক আমল-আকীদার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যুক্তিবাদের অতিমাত্রার উৎসাহী ব্যবহার মুতাযিলাদেরকে মানবিক আবেদন ও হৃদয়বৃত্তিক উপলব্ধি উপেক্ষায় সহায়তা করে আসছিল। মুতাযিলাদের এ জাতীয় কার্যক্রম ধর্মের সঙ্গে দর্শনের দূরত্ব এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বৈরিতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

এমন প্রেক্ষাপটে ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা থেকে আশারিয়া মতবাদের উৎপত্তি ঘটে। ধর্ম ও দর্শন– এ দ্বিবিধ চিন্তাপদ্ধতির ওপরে এ একান্তভাবে নির্ভর করতে দেখা যায়। মূলত এ মতবাদের মুখ্য

Scanned by CamScanner